الْمُهَذَّبُ مِنْ مَدَارِجِ السَّالِكِينَ গ্রন্থের অনুবাদ

পরিমার্জিত

মাদারিজুস সালিকীন

আল্লাহর পথে পথ চলতে একজন পথিককে যেসব মানযিলে অবতরণ করতে হয় তার সারগর্ভ বিবরণ

মূল : ইমাম ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ ﷺ

পরিমার্জন : শাইখ সালিহ আহমাদ শামি

অনুবাদ : মাওলানা আসাদ আফরোজ

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা.....

লেখকের কথা.....

প্রথম অধ্যায় : সূরা ফাতিহা সম্পর্কে আলোচনা.....

প্রথম পরিচ্ছেদ : সূরা আল-ফাতিহা'র উচ্চতর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য .....

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সূরা ফাতিহায় তাওহীদ বা একত্ববাদ.....

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সূরা ফাতিহা দুটি আরোগ্যকে ধারণ করে.....

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সূরা ফাতিহায় ইবাদাত এবং সাহায্য প্রার্থনা.....

ইবাদাত এবং সাহায্য প্রার্থনা .....

ইবাদাতকে সাহায্য প্রার্থনার আগে উল্লেখ করার কারণ.....

إِيَّاكَ-কে نَعْبُدُ ও نَسْتَعِيْنُ-এর পূর্বে উল্লেখ করার হিকমত.....

ইবাদাত ও সাহায্য প্রার্থনা অনুসারে মানুষের রকমফের .....

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾-এর বাস্তবায়ন.....

অনুসরণ ও একনিষ্ঠতা.....

ইবাদাতের ভিত্তিসমূহ.....

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ মৃত্যু পর্যন্ত আবশ্যক .....

দাসত্বের প্রকারভেদ.....

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ইলমি ও আমলিভাবে إِيَّاكَ نَعْبُدُ -এর স্তরসমূহ.....

দাসত্বের স্তর.....

সপ্তম পরিচ্ছেদ : اهْدِنَا-এর মধ্যে হিদায়াতের বিভিন্ন স্তর .....

দ্বিতীয় অধ্যায় : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾-এর মানযিলসমূহ.....

১ নং ভূমিকা : মানযিলসমূহের পূর্বকথা.....

মানযিলসমূহের স্তর ও সংখ্যা.....

মাকামের প্রকারভেদ.....

ভিন্ন আরেকটি প্রকারভেদ.....

মানযিলসমূহের ক্রমবিন্যাস নির্ধারণে পূর্ববর্তীদের তরীকা.....

মানযিলসমূহের ক্রমবিন্যাসে লেখকের তরীকা.....

২ নং ভূমিকা : পথচলা আরম্ভ করার পূর্বেই যা প্রয়োজন.....

১. জাগরণ/ সতর্কতা.....

২. চিন্তা-ফিকির .....

৩. দূরদর্শিতা.....
৪. সুদৃঢ় সংকল্প .....
মুহাসাবা ও সফরের সূচনা .....
১ নং মানযিল : তাওবা (اَلتَّوْبَةُ).....
তাওবাই হলো প্রথম ও শেষ মানযিল .....
তাওবা এবং সূরা ফাতিহা.....
তাওবার শর্তসমূহ.....
মাকবূল তাওবার কিছু আলামত..... .....
ইবাদাতের অহংকার থেকে বাঁচুন.....
বান্দাকে গুনাহ করতে ছেড়ে দেওয়ার রহস্য.....
শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচুন.....
বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য কি বিশেষ কোনো তাওবা রয়েছে?.....
তাওবার কতিপয় আহকাম.....
ইস্তিগফার ও তাওবার প্রকৃত মর্ম.....
তাওবার আলোচনা.....
ইস্তিগফারের আলোচনা.....
খাঁটি তাওবা বা আন্তরিক অনুশোচনা (اَلتَّوْبَةُ النَّصُوْحُ).....
ذَنْبٌ ও سَيِّئَةٌ-এর মাঝে পার্থক্য.....
বান্দার তাওবা আল্লাহর দুই তাওবা দ্বারা পরিবেষ্টিত .....
যুনূব বা গুনাহের প্রকারভেদ.....
যে সমস্ত গুনাহ থেকে তাওবা করতে হবে.....
গুনাহের ক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি.....
২ নং মানযিল : আল্লাহ-অভিমুখী হওয়া (اَلْإِنَابَةُ)
আল্লাহ-অভিমুখী হওয়ার কিছু আলামত.....
৩ নং মানযিল : শিক্ষা গ্রহণ করা (اَلتَّذَكُّرُ)..... ....
শিক্ষা গ্রহণের জন্য উপদেশের প্রতি বান্দার মুখাপেক্ষিতা.....
ফিকিরের সাথে কুরআন তিলাওয়াতের উপকারিতা.....
স্বল্প আশা শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে.....
৪ নং মানযিল : দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা (اَلْاِعْتِصَامُ).....
৫ নং মানযিল : পলায়ন করা (اَلْفِرَارُ).....
৬ নং মানযিল : সাধনা করা (اَلرِّيَاضَةُ).....
৭ নং মানযিল : শ্রবণ করা (اَلسَّمَاعُ).....

শ্রোতার প্রকারভেদ.....
শ্রবণ বা সামা'র হুকুম যা শোনা হয় তার সাথে সম্পর্কিত.....
আল্লাহ তাআলা যে শ্রবণের ব্যাপারে প্রশংসা করেছেন.....
যে শ্রবণকে আল্লাহ তাআলা ঘৃণা করেন.....
যারা গানবাজনাকে বৈধ বলে তাদের দলীল-প্রমাণসমূহ.....
উল্লেখিত দলীলসমূহের জবাব.....
৮ নং মানযিল : আল্লাহভীতি (اَلْخَوْفُ).....
৯ নং মানযিল : ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া (اَلْإِشْفَاقُ).....
১০ নং মানযিল : একাগ্রতা (اَلْخُشُوْعُ).....
একাগ্রতা বা খুশুর সংজ্ঞা.....
সালাতে একাগ্রতা.....
১১ নং মানযিল : নত হওয়া (اَلْإِخْبَاتُ).....
১২ নং মানযিল : দুনিয়াবিমুখতা (اَلزُّهْدُ) .....
দুনিয়াবিমুখতার পরিচয়.....
দুনিয়াবিমুখতার প্রকৃত মর্ম এবং এ সম্পর্কিত বিষয়াদি .....
দুনিয়াবিমুখতা অর্জন করার পদ্ধতি.....
১৩ নং মানযিল : অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকা (اَلْوَرَعُ).....
১৪ নং মানযিল : বিচ্ছিন্ন হওয়া (اَلتَّبَتُّلُ).....
১৫ নং মানযিল : আশা-আকাঙ্ক্ষা (اَلرَّجَاءُ).....
আশা সমস্ত মানযিলের চেয়ে অধিকতর সম্মানিত মানযিল.....
আশার কয়েকটি ফায়দা ও উপকারিতা.....
১৬ নং মানযিল : আগ্রহী হওয়া (اَلرَّغْبَةُ).....
১৭ নং মানযিল : যত্ন নেওয়া ও সংরক্ষণ করা (اَلرِّعَايَةُ).....
১৮ নং মানযিল : গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া (اَلْمُرَاقَبَةُ).....
১৯ নং মানযিল : আল্লাহ তাআলার সম্মানিত বস্তুসমূহকে সম্মান করা (تَعْظِيْمُ حُرُمَاتِ اللهِ).....
শাস্তির ভয় ও সাওয়াবের আশা না করে ইবাদাত করা কি সম্মান-প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত?.....
২০ নং মানযিল : আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা (اَلْإِخْلَاصُ).....
২১ নং মানযিল : সংশোধন ও পরিশোধন করা (اَلتَّهْذِيْبُ وَالتَّصْفِيَةُ).....
২২ নং মানযিল : স্থির ও অবিচল থাকা (اَلْاِسْتِقَامَةُ).....
২৩ নং মানযিল : আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করা (اَلتَّوَكُّلُ).....

তাওয়াক্কুলের মর্যাদা এবং তাওয়াক্কুলকারীদের প্রকারভেদ.....
তাওয়াক্কুলের সংজ্ঞা ও মনীষীদের মন্তব্য.....
তাওয়াক্কুলের প্রকৃত মর্ম .....
আল-আসমাউল হুসনার সাথে তাওয়াক্কুলের সম্পর্ক.....
তাওয়াক্কুল এবং উপকরণ.....
তাওয়াক্কুল এবং তাফবীয.....
আল্লাহর ওপর ভরসা এবং আল্লাহর ওপর আস্থা.....
২৪ নং মানযিল : নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া (اَلتَّسْلِيْمُ).....
২৫ নং মানযিল : ধৈর্য ধারণ করা (اَلصَّبْرُ).....
কুরআন ও সুন্নাহতে সবরের আলোচনা.....
সবরের পরিচয় এবং সবর সম্পর্কে বিজ্ঞজনদের বাণী.....
গুনাহের সাথে সম্পৃক্ততার বিচারে সবরের প্রকারভেদ.....
আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ততার বিচারে সবরের প্রকারভেদ.....
আল্লাহর নিকট অভিযোগ করা সবর-পরিপন্থি নয়.....
সবর এবং মহাব্বত.....
২৬ নং মানযিল : সন্তুষ্টি (اَلرِّضٰى).....
দ্বীনের মাকামসমূহের ভিত্তি হলো সন্তুষ্টি.....
সন্তুষ্টি এবং অভিভাবক বানানো.....
সন্তুষ্টির গুণ অর্জনযোগ্য নাকি আল্লাহ-প্রদত্ত?.....
ব্যথা-বেদনা অনুভব করা সন্তুষ্টির পরিপন্থি নয়.....
রিযা বা সন্তুষ্টির ফলাফল.....
সন্তুষ্টি সম্পর্কে মনীষীদের কতিপয় উক্তি.....
২৭ নং মানযিল : শোকর (اَلشُّكْرُ).....
শোকর আদায়ে উৎসাহদান.....
শোকরের প্রকৃত মর্ম.....
অনুগ্রহদাতার প্রশংসা করাও শোকর.....
২৮ নং মানযিল : লাজুকতা (اَلْحَيَاءُ).....
লাজুকতার প্রকারভেদ.....
২৯ নং মানযিল : সত্যবাদিতা (اَلصِّدْقُ).....
সত্যবাদিতার প্রকারভেদ.....
সত্যবাদিতার তাৎপর্য ও মর্মকথা.....
সত্যবাদিতার আলামত.....
সত্যবাদিতা সম্পর্কে সালাফদের কতিপয় উক্তি.....

৩০ নং মানযিল : অপরকে প্রাধান্য দেওয়া (اَلْإِيْثَارُ).....
দানশীলতার স্তর.....
আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সবকিছুর চেয়ে প্রাধান্য দেওয়া .....
৩১ নং মানযিল : উত্তম চরিত্র (حُسْنُ الْخُلُقِ).....
উত্তম চরিত্রের পরিচয়.....
অন্তর পরিশুদ্ধ করার পদ্ধতি.....
উত্তম চরিত্র অর্জনযোগ্য নাকি আল্লাহ-প্রদত্ত?.....
৩২ নং মানযিল : বিনয় (اَلتَّوَاضُعُ).....
৩৩ নং মানযিল : উদারতা (اَلْفُتُوَّةُ).....
উদারতার দুইটি চমৎকার উদাহরণ.....
৩৪ নং মানযিল : মানবিকতা (اَلْمُرُوْءَةُ).....
৩৫ নং মানযিল : ইচ্ছা (اَلْإِرَادَةُ).....
৩৬ নং মানযিল : শিষ্টাচার (اَلْأَدَبُ).....
আদব বা শিষ্টাচারের প্রকারভেদ .....
৩৭ নং মানযিল : দৃঢ় বিশ্বাস (اَلْيَقِيْنُ).....
ইয়াকীন অর্জনযোগ্য নাকি আল্লাহ-প্রদত্ত? .....
৩৮ নং মানযিল : আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠতা (اَلْأُنْسُ بِاللهِ).....
৩৯ নং মানযিল : আল্লাহর স্মরণ (اَلذِّكْرُ).....
যিক্‌র সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য .....
আল্লাহর স্মরণকারীদের মর্যাদা .....
যিক্‌রের প্রকারভেদ.....
৪০ নং মানযিল : দরিদ্রতা (اَلْفَقْرُ).....
৪১ নং মানযিল : পরিপূর্ণ অমুখাপেক্ষিতা (اَلْغِنَى الْعَالِيْ).....
অন্তরের প্রাচুর্য দ্বারা সার্বিক অমুখাপেক্ষিতা পূর্ণতা পায় .....
৪২ নং মানযিল : জ্ঞান (اَلْعِلْمُ).....
ইলম তিন প্রকার.....
৪৩ নং মানযিল : প্রজ্ঞা (اَلْحِكْمَةُ).....
৪৪ নং মানযিল : অন্তর্দৃষ্টি বা বিচক্ষণতা (اَلْفِرَاسَةُ).....
৪৫ নং মানযিল : প্রশান্তি (اَلسَّكِيْنَةُ).....
৪৬ নং মানযিল : নিশ্চিন্ততা (اَلطُّمَأْنِيْنَةُ).....

৪৭ নং মানযিল : ভালোবাসা (اَلْمَحَبَّةُ).....
ভালোবাসার সংজ্ঞা.....
বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা এবং আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালোবাসা.....
মহাব্বত সৃষ্টির কারণসমূহ.....
মহাব্বতের উৎস ও স্থায়িত্ব.....
৪৮ নং মানযিল : আত্মসম্মানবোধ (اَلْغَيْرَةُ).....
৪৯ নং মানযিল : আগ্রহ (اَلشَّوْقُ).....
৫০ নং মানযিল : স্বাদ আস্বাদন করা (اَلذَّوْقُ).....
৫১ নং মানযিল : পরিচ্ছন্নতা (اَلصَّفَاءُ).....
পরিচ্ছন্নতার একটি দিক হলো আপনি এমনভাবে ইবাদাত করবেন যেন আল্লাহকে দেখছেন.....
৫২ নং মানযিল : খুশি ও আনন্দ (اَلْفَرَحُ وَالسُّرُوْرُ).....
৫৩ নং মানযিল : অপরিচিতি হয়ে জীবনযাপন করা (اَلْغُرْبَةُ).....
অপরিচিতির প্রকারভেদ.....
(৫৪) অধ্যায় : জীবন বা প্রাণশক্তি (اَلْحَيَاةُ).....
জীবনের অনেকগুলো স্তর রয়েছে.....
(৫৫) অধ্যায় : সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততা (اَلْقَبْضُ وَالْبَسْطُ) .....
(৫৬) অধ্যায় : জানাশোনা (اَلْمَعْرِفَةُ).....
ইলম ও মা'রিফাতের মধ্যে পার্থক্য :.....
মা'রিফাতের আলামত ও নিদর্শন.....
(৫৭) তাওবা : সালিকীনদের সর্বশেষ মানযিল .....
(৫৮) অধ্যায় : তাওহীদ বা একত্ববাদ (اَلتَّوْحِيْدُ) .....
রাসূলগণ যে তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন.....
আল্লাহ তাআলার নিজের ব্যাপারে নিজের সাক্ষ্যদান.....
তাওহীদপন্থিদের পরস্পরের মাঝে পার্থক্য.....
সাধারণ মুসলিমদের দলীল-প্রমাণ.....

তৃতীয় অধ্যায় : নির্বাচিত প্রবন্ধমালা .....

(১) প্রবন্ধ : পরিভাষাসমূহ এবং এর থেকে সাধারণ মানুষের দূরত্ব.....
বিভিন্ন প্রকার পরিভাষাসংক্রান্ত আলোচনা.....
(২) প্রবন্ধ : উপকরণ অবলম্বন করা শারীআতের দাবি.....
(৩) প্রবন্ধ : 'নিশ্চিতভাবেই আমাকে তার কাছে পেতে'.....
(৪) প্রবন্ধ : যে পর্দাগুলো আল্লাহর ব্যাপারে অন্তরে আড়াল সৃষ্টি করে.....

অন্তরে আড়াল সৃষ্টিকারী পর্দা দশটি.....

(৫) প্রবন্ধ : অন্তর বিনষ্টকারী বস্তুসমূহ .....

(৬) প্রবন্ধ : আখিরাত থেকে দূরে থাকার যত কারণ .....

(৭) প্রবন্ধ : বিভিন্ন আমলের ফলাফল ও উপকারিতা .....

উপসংহার .....

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

প্রিয় পাঠক, আপনি এখন যে বইটি অধ্যয়ন করছেন তা হলো :

اَلْمُهَذَّبُ مِنْ مَّدَارِجِ السَّالِكِيْنَ بَيْنَ مَنَازِلِ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ﴾ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। মূলগ্রন্থ *'মাদারিজুস সালিকীন'*-এর রচয়িতা হলেন সপ্তম শতাব্দির বিখ্যাত আলিম ও দার্শনিক ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম জাওযিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ)। তার নাম শোনেননি এমন মানুষের সংখ্যা হাতেগোনা। তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ৬৯১ হিজরিতে সিরিয়ার দিমাশক শহরে। জীবনের পুরা সময়টাই তিনি দিমাশকে অতিবাহিত করেছেন। তার জীবনাবসানও হয়েছে সেখানেই ৭৫১ হিজরিতে। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ)-এর সুযোগ্য শাগরিদ। তার পিতাও ছিলেন তখনকার অনেক বড়ো একজন আলিম; যিনি দিমাশকের আল-মাদরাতুল জাওযিয়্যাহ-এর পরিচালক ছিলেন। এ কারণে তাকে বলা হতো قَيِّمُ الْجَوْزِيَّةِ (জাওযিয়্যাহর পরিচালক)। আর পিতার এই নামের সাথে যুক্ত করে তার ছেলে আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ (বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের লেখক)-কে ডাকা হতো 'ইবনু কাইয়্যিমিল জাওযিয়্যাহ' (জাওযিয়্যাহ মাদরাসার পরিচালকের ছেলে) বলে।

'মাদারিজুস সালিকীন' গ্রন্থটিকে সংক্ষেপ ও পরিমার্জিত করেছেন আরবের বিখ্যাত আলিম, লেখক ও সাহিত্যিক সালিহ আহমাদ শামি[১]। হাফিজাহুল্লাহ। *মাদারিজুস সালিকীন* ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ)-এর মৌলিক কোনো একক রচনা নয়। বরং এটি শাইখুল ইসলাম আবূ ইসমাঈল আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ হারাবি[২] (রহিমাহুল্লাহ)-এর *'মানাযিলুস সায়িরীন'* গ্রন্থেরই ব্যাখ্যা ও পরিপূরক এবং সেটিকে কেন্দ্র করেই লেখা। সালিহ আহমাদ শামি *'মাদারিজুস সালিকীন'* থেকে কেবল ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ)-এর কথা, মতামত ও সিদ্ধান্তগুলোই একত্র করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করে সাজিয়েছেন। *'মানাযিলুস সায়িরীন'* গ্রন্থের লেখকের কোনো অভিমতকে এখানে উল্লেখ করেননি। সুতরাং বলা যায়, অনূদিত এই গ্রন্থটির সম্পূর্ণ লেখাই ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ)-এর রচিত। আল্লাহ তাআলা মহান এই ইমামকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন। আমীন

---

[১] তিনি ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ার দিমাশ্ক শহরের বূমা নামক এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ৫০ বছর বয়সে স্বপরিবারে সৌদি আরবে এসে বসবাস শুরু করেন। বর্তমানে তিনি সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে অবস্থান করছেন। তার রচনাবলির মধ্যে অন্যতম হলো :

١. مِنْ مَعِيْنِ الشَّمَائِلِ ٢. مِنْ مَّعِيْنِ السِّيْرَةِ ٣. اَلْجَامِعُ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ

[২] জন্ম ৩৯৬ হিজরি এবং মৃত্যু ৪৮১ হিজরি। তিনিও হাম্বালি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

লেখকের কথা

প্রশংসা সবই আল্লাহর, যিনি মহাবিশ্বের অধিপতি। সুন্দর পরিণতি তাদের জন্য অপেক্ষমাণ, যারা আল্লাহর নাফরমানি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে। শাস্তিলাভের উপযুক্ত তারাই, যারা জুলুমের পথে চলে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তিনি মহাবিশ্বের অধিপতি, তিনি সমস্ত রাসূলের ইলাহ্, আসমান-জমিনের পরিচালক। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি—মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল, যাঁকে পাঠানো হয়েছে প্রাঞ্জল কিতাব দিয়ে, যা পার্থক্যরেখা টেনে দেয়—হিদায়াত ও ভ্রষ্টতার মাঝে, সঠিক পথ ও ভুল পথের মাঝে, নিশ্চিত জ্ঞান ও সংশয়ের মাঝে।

আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন এ উদ্দেশ্য নিয়ে—আমরা যেন চিন্তাশীল মন নিয়ে তা পাঠ করি, সেখান থেকে অন্তর্দৃষ্টি লাভের চেষ্টা করি, তা থেকে উপদেশ নিয়ে ধন্য হই, এর সর্বোত্তম অর্থকে গ্রহণ করি, এর সংবাদগুলোকে সত্য বলে মেনে নিই, এর বিধিনিষেধ বাস্তবায়নের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করি, এর বৃক্ষ থেকে উপকারী-জ্ঞান-সদৃশ ফল আহরণ করি—যা মানুষকে আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্যে পৌঁছে দেবে—আর এর বাগান ও পুষ্পরাজি থেকে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা-সদৃশ সুবাসিত উদ্ভিদ সংগ্রহ করি।

কুরআন আল্লাহর কিতাব, যা আল্লাহকে-চিনতে-ইচ্ছুক ব্যক্তিকে পথ দেখায়; এ হলো তাঁর দেখানো পথ, যা পথিককে তাঁর কাছে নিয়ে যায়; তাঁর স্পষ্ট আলো, যা অন্ধকার দূর করে দেয়; তাঁর দেওয়া রহমত, যাতে রয়েছে সৃষ্টিজগতের সবার কল্যাণ; তাঁর ও তাঁর বান্দার মধ্যে সংযোগকারী মাধ্যম, যখন অন্যসব মাধ্যম ছিন্ন হয়ে যায় তখন কেবল এ মাধ্যমটিই টিকে থাকে; আর (এ হলো) তাঁর কাছে পৌঁছার বিশাল প্রবেশদ্বার, সব দরজা বন্ধ হলেও এ দরজা কখনো বন্ধ হবে না।

কুরআনই হলো সেই সরল পথ, যে পথে চললে মানুষের চিন্তাধারা কখনো বিকৃত হয় না; সেই প্রজ্ঞাময় স্মারক যা থাকলে মন কখনো বাঁকাপথে যায় না; মহান আপ্যায়ন যার ব্যাপারে বিদ্বানরা কখনো তৃপ্ত হয় না; যার বিস্ময় শেষ হবার নয়; যার ছায়া কখনো সরে যাবে না; যার নিদর্শন অফুরন্ত; যার উত্থাপিত প্রমাণগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই; এ কিতাব নিয়ে যত চিন্তাভাবনা করা হয়, হিদায়াত ও অন্তর্দৃষ্টি ততই বৃদ্ধি পায়; আর যখনই এর সরোবর উন্মুক্ত করা হয়, তখনই সেখান থেকে প্রবলবেগে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার ফোয়ারা ছুটতে থাকে।

কুরআন হলো চোখের অন্ধত্ব-দূরকারী আলো, অন্তরকে ব্যাধিমুক্ত রাখার ওষুধ, অন্তরের সঞ্জীবনীশক্তি, মনের প্রফুল্লতা, অন্তরের বাগিচা, আত্মাকে আনন্দময় জগতে প্রেরণের চালিকাশক্তি, আর সকালসন্ধ্যায় এ কথার ঘোষক—"সফলতা-সন্ধানীরা! সফলতার দিকে আসো!" সীরাতে মুসতাকীমের মাথায় দাঁড়িয়ে ঈমানের ঘোষক এভাবে ডাকছে—

يَا قَوْمَنَا أَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللهِ وَآمِنُوْا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ ﴿٣١﴾

“আমাদের স্বজাতির লোকজন! তোমরা আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর ওপর ঈমান আনো, তা হলে তিনি তোমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দেবেন আর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে তোমাদের মুক্তি দেবেন।”[৩]

সুবহানাল্লাহ! যারা ওহির মূলপাঠ এড়িয়ে চলে, যারা এর বিশাল জ্ঞানভান্ডারের কুলুঙ্গি থেকে জ্ঞান সংগ্রহ করে না—তারা যে কী বিশাল জিনিস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে!! অন্তরের জীবনীশক্তি, চোখের উজ্জ্বল জ্যোতি আরও কত কিছু যে তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে!!

যে তার রবের কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ থেকে দূরে থাকে, সে কি মনে করে—মানুষের বুদ্ধিপ্রসূত মতামতের দোহাই দিয়ে তার রবের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবে? অথবা প্রচুর জ্ঞান-গবেষণা, যুক্তিতর্ক, বুদ্ধিবৃত্তিক উদাহরণ ও রকমারি প্রশ্ন-উত্থাপন কিংবা ইশারা-ইঙ্গিত, লাগামছাড়া আলোচনা, নানারকম কাল্পনিক চিত্র উপস্থাপন—এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর শক্ত পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে?

আল্লাহর কসম! এ এক বিরাট ভুল ধারণা! যে এমনটা ধারণা করেছে, তার ধারণা জঘন্য মিথ্যা! তার মন তাকে অসম্ভব জিনিসের প্রবোধ দিয়েছে। বাস্তবতা হলো—নাজাত কেবল সেই ব্যক্তির জন্যই নির্ধারিত, যে আল্লাহর দেখানো পথকে অন্য সবার মতের ওপর প্রাধান্য দেয়, তাকওয়ার রসদ সংগ্রহ করে, দলীলের অনুসরণ করে, সরল পথে চলে, আর ওহিকে এমন মজবুত রশি দিয়ে আঁকড়ে ধরে যা কখনো ছিঁড়বার নয়। আল্লাহ সব শোনেন, জানেন।

মূলকথায় আসি। মানুষের পূর্ণতা মাপা হয় উপকারী জ্ঞান ও ভালো কাজ—এ দুয়ের ভিত্তিতে; আর জিনিস দুটি হলো যথাক্রমে ‘হিদায়াত’ ও ‘দ্বীনে হক’। অন্যদের ভেতর পূর্ণতা আনতে হলেও, আনতে হবে এ দুটি জিনিসের মাধ্যমেই, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

“শপথ মহাকালের! সব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; ব্যতিক্রম কেবল তারা—যারা ঈমান আনে, ভালো ভালো কাজ করে, একে অপরকে সত্যের উপদেশ দেয়, আর দেয় ধৈর্যধারণের পরামর্শ।”[৪]

আল্লাহ তাআলা শপথ করে বলেছেন—প্রত্যেকেই ক্ষতিগ্রস্ত, ব্যতিক্রম কেবল সে, যে তার জ্ঞানের শক্তিকে ঈমান দিয়ে পূর্ণ করে, কর্মের শক্তিকে পূর্ণ করে ভালো কাজের দ্বারা, আর অন্যকে পূর্ণতা দেয় সত্য-অনুসরণ ও ধৈর্যধারণ—এ দুয়ের উপদেশ দেওয়ার মাধ্যমে। (এখানে) সত্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঈমান ও আমল; আর এ দুটি বিষয় পূর্ণতা পায় না, যতক্ষণ-না এ দুটি বিষয়ে ধৈর্য ধরা হয় এবং পরস্পরকে এ দুটি বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়। মানুষের দায়িত্ব হলো তার জীবনের সময়গুলো—বরং প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাস—এমন কাজে খরচ করা যার মাধ্যমে সে তার সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে এবং যার দ্বারা সুস্পষ্ট ক্ষতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে। আর তা কেবল তখনই সম্ভব, যখন সে কুরআনের দিকে এগিয়ে আসবে, তা

---

[৩] সূরা আহ্কাফ, ৪৬ : ৩১।

[৪] সূরা আসর, ১০৩ : ১-৩।

ভালোভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা চালাবে, তা নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করবে, এর বিপুল সম্পদ লাভ ও এর গুপ্তধন উত্তোলনের উদ্যোগ নেবে, এর জন্য কষ্ট বরদাশত করবে এবং এর পেছনে সবসময় লেগে থাকবে। কারণ, দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে কুরআনই হলো বান্দার কল্যাণের জিম্মাদার, এটিই তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করবে, এটিই হাকীকত, এটিই তরীকত, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও মহিমা-প্রকাশের সঠিক মাধ্যম এটিই। এ সবকিছুই নিতে হবে কেবল কুরআনের কুলুঙ্গি থেকে, আর ফল লাভের আশা করা যায় শুধু এরই বৃক্ষ থেকে।

আল্লাহর মদদে আমরা এ বিষয়ে (পাঠকদের) দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যাচ্ছি। আর তা করা হবে কুরআনের মূল, সূরা ফাতিহা সম্পর্কে কিছু কথা বলার মাধ্যমে। (মানবজীবনের) লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আল্লাহর পথের পথিকদের বিভিন্ন মানযিল, আল্লাহর মারিফাত-লাভকারীদের অবস্থান, সেসবের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ও উপকরণের মধ্যকার পার্থক্য, আল্লাহর দান ও নিজের উপার্জন—এসব ব্যাপারে এ সূরা যা ধারণ করেছে এবং তাতে যা বলা হয়েছে, তার ওপর আলোকপাত করা হবে। আর স্পষ্টভাবে দেখানো হবে, (এসব বিষয়ে) এ সূরার যে অবস্থান, অন্য কোনো সূরা-ই সেই অবস্থানে নেই; এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাওরাত ও ইনজীলে—এমনকি কুরআনেও—এর অনুরূপ কোনো সূরা নাযিল করেননি।

আল্লাহ তাআলাই সাহায্য-লাভের উৎস, ভরসা করতে হবে কেবল তাঁরই ওপর, মহামহিম আল্লাহ ছাড়া না আছে কারও কোনো শক্তি, আর না আছে কোনো সামর্থ্য।

***

প্রথম অধ্যায় : সূরা ফাতিহা সম্পর্কে আলোচনা

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿٢﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿٥﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ﴿٧﴾

"পরম করুণাময়, বিশেষ দয়ালু আল্লাহর নামে। প্রশংসা সবই আল্লাহর, যিনি মহাবিশ্বের অধিপতি, পরম করুণাময়, বিশেষ দয়ালু, প্রতিদান দিবসের মালিক। আমরা কেবল তোমারই দাসত্ব করি, আর তোমার কাছেই সাহায্য চাই। আমাদের সরল পথ দেখাও—তাঁদের পথ, যাঁদের ওপর তুমি করুণা করেছ; ওদের পথ নয়, যারা (তোমার) ক্রোধের শিকার হয়েছে, ওদের পথও নয়, যারা ভুল পথে চলছে।"[৫]

[৫] সূরা ফাতিহা ১ : ১-৭।

প্রথম পরিচ্ছেদ : সূরা ফাতিহা'র উচ্চতর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

প্রথমে বুঝে নিতে হবে, এ সূরায় বেশকিছু মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের কথা পূর্ণাঙ্গভাবে স্থান পেয়েছে :

১. এতে তিনটি নামে মহান মা'বূদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে; (আল্লাহ তাআলার) আল-আসমাউল হুসনা ও উচ্চতর গুণসমূহের উৎস ও ভিত্তি হলো এ তিনটি নাম : আল্লাহ, রব ও রহমান। আর এ সূরার ভিত্তি রাখা হয়েছে ইলাহিয়্যাত, রুবূবিয়্যাত ও রহমতের ওপর।

সুতরাং ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ "আমরা কেবল তোমার দাসত্ব করি"—এটি আল্লাহ তাআলার 'ইলাহিয়্যাত'-নির্দেশক।

﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾ "আর তোমার কাছেই সাহায্য চাই"—এটি 'রুবূবিয়্যাত'-নির্দেশক।

আর তাঁর কাছে সরল পথের নির্দেশনা চাওয়া—এটি 'রহমত'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। 'প্রশংসা'র ভেতরও এ তিনটি বিষয় রয়েছে : আল্লাহ তাআলা তাঁর ইলাহিয়্যাত, রুবূবিয়্যাত ও রহমত সবদিক দিয়েই প্রশংসিত। গুণকীর্তন ও মহিমা-প্রকাশ—এ দুটি হাম্‌দ বা প্রশংসাকে পূর্ণতা দেয়।

২. এ সূরা আখিরাতকে সাব্যস্ত করা, ভালো ও মন্দ কাজের ভিত্তিতে বান্দার আমলের প্রতিদান, সেদিন মহান রবের একক কর্তৃত্ব এবং তাঁর ইনসাফপূর্ণ বিচার—এসব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর এ সবগুলোই রয়েছে ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾ "প্রতিদান দিবসের মালিক" আয়াতটির অধীনে।

৩. এ সূরায় বেশ কয়েকটি দিক দিয়ে নুবুওয়াতের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে :

ক) আল্লাহ তাআলা "মহাবিশ্বের অধিপতি" (رَبُّ الْعَالَمِيْنَ), সুতরাং তাঁর বান্দাদের অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া তাঁর শানের সঙ্গে মানানসই নয়। দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্য কোন জিনিস উপকারী আর কোন জিনিস ক্ষতিকর—সেসবের পরিচয় বান্দাদের সামনে তুলে ধরবেন না, এমন চিন্তা লালন করা মানে (আল্লাহ তাআলার) রুবূবিয়্যাতকে নাকচ করে দেওয়া এবং মহান রবের সঙ্গে এমন কিছু জুড়ে দেওয়া যা তাঁর সঙ্গে একেবারে বেমানান। যারা এ কাজ করে, তারা আল্লাহকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে পারেনি।

খ) তাঁর একটি নাম 'পরম করুণাময়' (اَلرَّحْمٰنُ)। তাঁর করুণা তাঁর বান্দাদের উদ্দেশ্যহীনভাবে ছেড়ে দিতে বাধা দেয়। কী করলে বান্দারা পূর্ণতার শিখরে পৌঁছুতে পারবে, তা তিনি বলবেন না—এমন ধারণাকেও 'করুণাময়' নাম বাধা দেয়। যে ব্যক্তি 'করুণাময়' শব্দটিকে যথাযথ অধিকার দেয়, সে জানে—বৃষ্টিবর্ষণ করা, তৃণলতা গজিয়ে তোলা ও বীজ থেকে চারা উদগত করা—এসব কাজের সঙ্গে 'রহমান' নামের যেটুকু সম্পর্ক, তার চেয়ে বেশি সম্পর্ক রাসূল পাঠানো ও কিতাব নাযিল করার সঙ্গে। দেহ ও বাহ্যিক সূরত সজীব রাখার জন্য আল্লাহর করুণা যেটুকু প্রয়োজন, কল্‌ব ও রূহকে সজীব রাখার জন্য আল্লাহর করুণার প্রয়োজন

তার চেয়ে বহুগুণ বেশি। কিন্তু, যাদের চোখে পর্দা পড়ে আছে তারা 'করুণাময়' শব্দের মধ্যে জন্তুজানোয়ারের প্রয়োজন মেটানোর বিষয়টিই দেখতে পায়, আর বুদ্ধিমান লোকেরা এর মধ্যে তার চেয়েও বেশিকিছু দেখতে পায়।

গ) এ সূরায় 'প্রতিদান দিবস' (يَوْمُ الدِّيْنِ)-এর কথা বলা হয়েছে। কারণ সেদিন বান্দাদের আমল অনুযায়ী পাওনা পরিশোধ করা হবে—ভালো কাজের জন্য তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে আর অবাধ্যতা ও গুনাহের জন্য দেওয়া হবে শাস্তি। তবে, প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার আগ-পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেওয়া আল্লাহর শানে মানানসই নয়; প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় রাসূল ও আসমানি কিতাব পাঠানোর মাধ্যমে; তাদের পাঠানোর পরই পুরস্কার ও শাস্তি অবধারিত হয়ে ওঠে; তাদের ভিত্তিতেই বিচারের দিন 'হাঁকিয়ে নেওয়ার ঘটনা' ঘটবে—ভালো লোকদের নেওয়া হবে জান্নাতে আর গুনাহগারদের নেওয়া হবে জাহান্নামে।

ঘ) আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ﴾ "আমাদের সরল পথ দেখাও"। হিদায়াত বা পথ-দেখানো মানে পথের বিবরণ ও নির্দেশনা দেওয়া, তারপর (সেই পথে) চলার সামর্থ্য ও প্রয়োজনীয় সংকেত দেওয়া, আর শেষের এ দুটি হয়ে থাকে পথের বিবরণ ও নির্দেশনা দেওয়ার পর। পথের বিবরণ ও নির্দেশনা দেওয়া—এ দুটি কাজ কেবল আল্লাহর প্রেরিত রাসূলদের দ্বারাই সম্ভব। পথের বিবরণ, নির্দেশনা ও পরিচয়—এসবের পরে আসে পথচলার সামর্থ্যের বিষয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে জানা যায়—আল্লাহর কাছে সরল পথের নির্দেশনা চাওয়া, বান্দার সব প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জরুরি। যারা বলে 'আমরা তো (কুরআনের মাধ্যমে) হিদায়াত পেয়ে গিয়েছি, আবার হিদায়াত চাইব কীভাবে?', তাদের এ প্রশ্ন অবান্তর। কারণ, আল্লাহর নাযিল-করা হকের ব্যাপারে আমরা যা জানি, তার চেয়ে না-জানার পরিমাণ বহুগুণ বেশি। আমরা যা করতে চাই, পরিমাণে তার চেয়ে বেশি অথবা কম অথবা সমান হলো সেসব কাজ যা আমরা তুচ্ছ মনে করে ও অলসতার কারণে করতে চাই না। কিছু কাজ আমরা করতে চাই, কিন্তু সামর্থ্যের অভাবে করতে পারি না এমন ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এসব বিষয়ের পূর্ণ ও বিস্তারিত চিত্র আমাদের সামনে নেই; তাই আমরা কী পরিমাণ কাজ করতে পারছি না, তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে আমাদের দরকার পরিপূর্ণ হিদায়াত। যে এসব বিষয় পরিপূর্ণভাবে হাসিল করতে পেরেছে, আল্লাহর কাছে তার হিদায়াত চাওয়ার উদ্দেশ্য হলো সে যেন হিদায়াতের ওপর অবিরামভাবে অটল ও অবিচল থাকতে পারে।

হিদায়াতের আরেকটি স্তর আছে, সেটি হলো এর সর্বশেষ স্তর। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন জান্নাতে যাওয়ার পথপ্রদর্শন। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আল্লাহর সরল পথের দিশা পায়—যে সরল পথ দিয়ে তিনি তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন আর কিতাব নাযিল করেছেন—, আখিরাতেও সে সরল পথের দিশা পাবে, যা তাকে জান্নাত ও পুরস্কার-গৃহে পৌঁছে দেবে। এ দুনিয়ায় আল্লাহর নির্ধারিত সরল পথের ওপর বান্দা যতটুকু অটল থাকবে, জাহান্নামের ওপর স্থাপিত পুলসিরাতের ওপর সে ততটুকুই অটল থাকতে পারবে; দুনিয়ায় সরল পথে যে গতিতে সে চলেছে, পুলসিরাতেও তার গতি থাকবে ততটুকু: তাদের মধ্যে কেউ পার হবে বিজলির গতিতে, কেউ চোখের পলকে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ বাহনের গতিতে, কেউ দৌড়ে, কেউ পায়ে

হেঁটে, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে, কেউ নতজানু হয়ে গায়ে অনেক আঁচড় লাগিয়ে, আবার কেউ নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে।

যে ব্যক্তি পুলসিরাতে তার গতি কেমন হবে তা দেখতে চায় সে যেন এ দুনিয়ায় সীরাতে মুসতাকীমের ওপর তার গতি দিকে তাকায়। কারণ সেখানে সে হুবহু একই গতি প্রাপ্ত হবে, যা হবে তার যথাযথ পাওনা :

هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾

"তোমরা যা করছিলে, (আজ) কেবল তারই পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া হবে।"[৬]

ঙ) এ সূরায় অনুগ্রহপ্রাপ্ত লোকদের কথা উল্লেখ করে তাদেরকে গজবপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট দুটি দল থেকে আলাদা করা হয়েছে। সত্যকে জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা—এসবের ভিত্তিতে মানুষ এই তিনভাগে বিভক্ত। শারীআতের-আওতাধীন-মানুষ কখনো এ তিনশ্রেণির বাইরে যেতে পারে না। কারা অনুগ্রহপ্রাপ্ত, কারা গজবের শিকার আর কারা পথভ্রষ্ট—এসব বিষয় নুবুওয়াত ও রিসালাতকে অপরিহার্য করে তোলে (অর্থাৎ, রিসালাত ছাড়া এসব বিষয় জানার কোনো সুযোগ নেই)।

৪. اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ-এ اَلصِّرَاطُ শব্দটি একবচন; পাশাপাশি একে দুদিক দিয়ে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে: প্রথমবার (শুরুতে) আলিফ-লাম লাগিয়ে, আর দ্বিতীয়বার আরেকটি শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ করার মাধ্যমে। ফলে বিষয়টি সুনির্দিষ্ট ও বিশেষায়িত হয়েছে, অর্থাৎ সিরাতে মুস্তাকীম একটিই।

বিপরীতদিকে, গজব ও ভ্রষ্টতার পথগুলোর ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা কখনো বহুবচন আবার কখনো একবচন ব্যবহার করেন; যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ

"এ হলো আমার-দেওয়া সিরাতে মুস্তাকীম, তোমরা এ পথ অনুসরণ করো; অনেক পথ অনুসরণ করো না, তা হলে সেগুলো তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে অন্যদিকে নিয়ে যাবে।"[৭]

এ আয়াতে আল্লাহ নিজের পথ বোঝাতে 'সিরাত' ও 'সাবীল' একবচন ব্যবহার করেছেন, আর এর বিপরীত পথগুলোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন এর বহুবচন 'সুবুল'।

ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের সামনে একটি রেখা টেনে বললেন,

هٰذَا سَبِيْلُ اللهِ

[৬] সূরা নাম্‌ল, ২৭ : ৯০।
[৭] সূরা আনআম, ৬ : ১৫৩।

“এটি আল্লাহর পথ”, তারপর এর ডানে-বামে কয়েকটি রেখা টেনে বললেন,

هٰذِهِ سُبُلٌ، عَلٰى كُلِّ سَبِيْلٍ شَيْطَانٌ يَدْعُوْ إِلَيْهِ

“এ হলো অনেক পথ, প্রত্যেকটি পথে একজন করে শয়তান আছে, সে ওই পথের দিকে ডাকছে।”

এরপর নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ আয়াত পাঠ করেন:

وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ۚ ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٥٣﴾

“এ হলো আমার-দেওয়া সিরাতে মুস্‌তাকীম, তোমরা এ পথ অনুসরণ করো; অনেক পথ অনুসরণ করো না, তা হলে সেগুলো তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে অন্যদিকে নিয়ে যাবে।” আল্লাহ তোমাদের এ নির্দেশ দিচ্ছে, যাতে তোমরা তার নাফরমানি থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারো।”[৮] [৯]

এর কারণ হলো—আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছানোর রাস্তা মাত্র একটি। আর সেটি ওই রাস্তা, যা দিয়ে তিনি তাঁর রাসূলদের পাঠিয়েছেন, যার বিবরণ দিয়ে তিনি আসমানি কিতাবগুলো নাযিল করেছেন; এ রাস্তা ছাড়া কেউ তাঁর কাছে পৌঁছুতে পারবে না। মানুষ যদি অন্যসব রাস্তায় গিয়ে প্রত্যেকটি দরজায় কড়া নাড়ে, তারা দেখবে—একপর্যায়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, ব্যতিক্রম কেবল এই একটি পথ, যা আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত, যা মানুষকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়।

সিরাতে মুস্‌তাকীম-সন্ধানী যেহেতু এমন এক বিষয়ের সন্ধানে নেমেছে, যা থেকে বেশিরভাগ মানুষ সরে যায়, সে যেহেতু এমন এক পথে চলতে চাচ্ছে, যে পথে বন্ধুর সংখ্যা খুবই কম ও দুর্লভ, আর প্রকৃতিগতভাবেই একাকিত্ব মানুষের কাছে অপছন্দের এবং বন্ধুর প্রতি থাকে তার গভীর মমত্ববোধ ও ঘনিষ্ঠতা, তাই আল্লাহ তাআলা এ পথের বন্ধুদের ব্যাপারে জানিয়ে দিয়েছেন :

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيْقًا ﴿٦٩﴾

“যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা থাকবে সেসব লোকের সঙ্গে যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, আর তারা হলেন নবি, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককার বান্দাগণ; তারা অত্যন্ত চমৎকার বন্ধু।”[১০]

আল্লাহ তাআলা সিরাতে মুস্‌তাকীমকে সেসব বন্ধুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে দিয়েছেন, যারা এ পথের পথিক, যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, যাতে যে ব্যক্তি হিদায়াত খুঁজে ফিরে আর সীরাতে

---

[৮] সূরা আনআম, ৬ : ১৫৩।

[৯] দারিমি, ২০২; ইবনু মাজাহ, ১১।

[১০] সূরা নিসা, ৪ : ৬৯।

মুসতাকীমের ওপর চলতে চায়, তার মন থেকে যেন নিজ জামানার স্বজাতীয় লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার বেদনা দূর হয়ে যায়, যাতে সে বুঝতে পারে—এ পথে তার বন্ধু হলো সেসব লোক যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; ফলে এ পথ-থেকে-সরে-যাওয়া লোকদের বিরোধিতাকে সে মোটেই পরোয়া করবে না, কারণ সংখ্যায় তারা বেশি হলেও মর্যাদায় তারা খুবই নগণ্য, যেমন পূর্ববর্তী মনীষীদের কোনো একজন বলেছিলেন—'সত্যপথে অটল থেকো, ওই পথের পথিক কম হলেও নিজেকে একা মনে কোরো না; আর মিথ্যার পথ থেকে দূরে থেকো, ধ্বংসের-পথে-পা-বাড়ানো লোকদের সংখ্যাধিক্য যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে।' সিরাতে মুস্‌তাকীমে চলতে গিয়ে যদি কখনো নিজেকে বড্ড একা মনে হয়, তা হলে তোমার-আগে-চলে-যাওয়া বন্ধুর দিকে তাকিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা লালন কোরো, তাদের ছাড়া অন্যদের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রেখো, কারণ আল্লাহর সামনে তারা তোমার কোনো উপকারে আসবে না, তোমার সিরাতে মুস্‌তাকীমের ওপর চলা দেখে তারা যতই চিৎকার চেঁচামেচি করুক, তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ কোরো না।

যেহেতু সিরাতে মুস্‌তাকীমের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে দিক্‌নির্দেশনা চাওয়া হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য, আর তার সন্ধান পাওয়া হলো আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ দান, তাই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের শিখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে সেটি চাইতে হবে, তিনি তাদের নির্দেশনা দিয়েছেন তারা যেন সিরাতে মুস্‌তাকীম চাওয়ার আগে তাঁর প্রশংসা-স্তুতি ও মহিমা বর্ণনা করে। এরপর তিনি তাঁর তাওহীদ ও ইবাদাত পাওয়ার অধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন।

তাঁর নাম ও গুণসমূহের ওসীলা এবং তাঁর ইবাদাতের ওসীলা—এ দুটি হলো বান্দার কাঙ্ক্ষিত মানযিলে পৌঁছার মাধ্যম। এ দুটি ওসীলা থাকলে, দুআ কবুল না হয়ে পারে না।

***

দ্বিতীয় অধ্যায় :

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾-এর মানযিলসমূহ

১ নং ভূমিকা : মানযিলসমূহের পূর্বকথা

মানযিলসমূহের স্তর ও সংখ্যা

সূফিয়ায়ে কেরাম ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾-এর মানযিলসমূহের ব্যাপারে অনেক আলোচনা করেছেন; আল্লাহর পথে চলা অবস্থায় অন্তর এক এক করে সেই মানযিলগুলো অতিক্রম করে আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়।

তাদের কেউ কেউ এর মানযিলসমূহ গণনা করে এর এক হাজারটি মানযিল পেয়েছেন। কেউ কেউ পেয়েছেন একশটি আর কেউ পেয়েছেন এর চেয়ে বেশি কিংবা কম।

মানযিলসমূহ ও এর তারতীবের ব্যাপারে সূফিয়ায়ে কেরামের বেশ মতভেদ রয়েছে। প্রত্যেকেই আপন আপন অবস্থা ও পথচলা অনুসারে তা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে কিছু কিছু মানযিলের ক্ষেত্রে এই মতভেদও রয়েছে যে, তা মাকামের অন্তর্ভুক্ত নাকি হালের?

এ দুটির মধ্যে পার্থক্য হলো : মাকাম হচ্ছে অর্জনযোগ্য আর হাল হচ্ছে আল্লাহ-প্রদত্ত।

তাদের কেউ কেউ বলেছেন, হাল হলো মাকামের ফল আর মাকাম হলো আমলের ফল। সুতরাং যে ব্যক্তির আমল উত্তম ও ভালো সে উচ্চ মাকামের অধিকারী। আর যে উচ্চ মাকামের অধিকারী তার হাল (অন্তরগত অবস্থা)-ও উচ্চ স্তরের হয়ে থাকে।

এ ক্ষেত্রে সঠিক অভিমত হলো মানযিলসমূহের অবস্থা অনুসারে এর বিভিন্ন নাম রয়েছে। সূচনা ও প্রাথমিক অবস্থায় এর ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি ও ঝলক প্রকাশ পায় যেমন দূর থেকে বজ্রমেঘের বেশ ঝলক ও দীপ্তি দেখা যায়। অতঃপর যখন বিষয়টি ব্যক্তির মাঝে এসে পড়ে তখন 'হাল'-এর সৃষ্টি হয়। এরপর যখন তা স্থায়ী ও দৃঢ়ভাবে স্থান করে নেয় তখন তা মাকাম-এ পরিণত হয়।

এটি প্রথমে ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তির পর্যায়ে থাকে, মাঝপথে তা হালে রূপান্তরিত হয় আর শেষে তা মাকামে পরিণত হয়। প্রথমে যেটি ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তি ছিল পরবর্তী সময়ে হুবহু তা-ই হাল, আর হাল-ই এর পরে মাকামে পরিণত হয়। এই সমস্ত নাম হচ্ছে অন্তরের সাথে এর সম্পর্ক, প্রকাশমানতা ও দৃঢ়তার ভিত্তিতে।

সালিক কখনো কখনো তার মাকাম থেকে বেরিয়ে যায় যেমন তার পরিহিত কাপড় থেকে বেরিয়ে যায় এবং আগের চেয়ে নিম্নস্তরের মাকামে অবতরণ করে। অতঃপর আবার কখনো সেখানে ফিরে আসতে পারে আবার কখনো পারে না।

মানযিলসমূহের ক্রমবিন্যাসে লেখকের তরীকা

আমাদের জন্য সর্বোত্তম হলো আমরা কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত ইবাদাত ও দাসত্বের মানযিলগুলো উল্লেখ করব এবং এর স্তর ও সীমানার পরিচয় তুলে ধরব। কারণ সেগুলো সম্পর্কে জানা আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রাসূলের ওপর যা কিছু নাযিল করেছেন তা জানাকে পূর্ণতা দান করে। আর যারা তা জানে না আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে মূর্খতা ও নিফাকের দোষে দোষী করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا۟ حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ ۗ

"বেদুইন আরবরা কুফরি ও মুনাফিকিতে অত্যন্ত কঠোর এবং আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের প্রতি যা কিছু নাযিল করেছেন তার সীমারেখা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞ থাকার আশঙ্কাই বেশি।"[১১]

সুতরাং প্রত্যেকে জন্য আবশ্যক হলো ইসলামের নির্ধারিত সীমারেখা সম্পর্কে গভীরভাবে জানা এবং খুব যত্নসহকারে তা পালন করা। তা হলে বান্দা এর মাধ্যমে তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নেবে এবং সে ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾-এর গুণে গুণান্বিত বলে সাব্যস্ত হবে।

আমরা মানযিলসমূহের একটি ক্রমবিন্যাস উল্লেখ করব তবে তা অপরিহার্য কোনো বিষয় নয়; বরং উত্তমতার ভিত্তিতে এবং বাহ্যিক অবস্থা অনুসারে তা উপস্থাপন করব। যাতে বিষয়টি উপলব্ধি করতে সুবিধা হয়, ভালোভাবে জানা যায় এবং সহজেই তা অর্জন করে নেওয়া যায়।

***

১ নং মানযিল : তাওবা (اَلتَّوْبَةُ)

তাওবাই হলো প্রথম ও শেষ মানযিল

তাওবার মানযিল হচ্ছে প্রথম, মধ্যম ও শেষ মানযিল। সুতরাং আল্লাহর পথের পথিক কখনো তাওবা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। সে মৃত্যু পর্যন্ত এর মধ্যেই থাকে। যদি অন্য মানযিলে যায় তবে তাওবাকে সাথে

[১১] সূরা তাওবা, ৯ : ৯৭।

নিয়েই যায়, তাওবা হলো তার সবসময়ের সঙ্গী। এটিই বান্দার পথের শুরু, এটিই শেষ। তবে শুরুর সময়ের ন্যায় শেষ পর্যায়েও তাওবার প্রয়োজন তীব্র ও প্রকট আকার ধারণ করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾

"হে মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তাওবা করো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।"[১২]

এটি সূরা নূরের একটি আয়াত। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির সেরা মুমিন বান্দাদের সম্বোধন করে বলেছেন যে, তারা যেন তার নিকট তাওবা করে, ফিরে আসে। অথচ তারা ঈমান এনেছে, কাফিরদের দেওয়া অনেক কষ্ট ও অত্যাচার সহ্য করেছে, তাঁর পথে হিজরত করেছে এবং তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে জানমাল দিয়ে জিহাদ করেছে। অতঃপর সফলতাকে তাওবার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন; যেমন উপকরণকে উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। আল্লাহ তাআলা এখানে لَعَلَّ (আশা করা যায় বা হয়তো) ব্যবহার করেছেন—এটি বুঝানোর জন্য যে, তোমরা যখন তাওবা করবে তখন তোমাদের সফলতার আশা করা যায়। সুতরাং কেবল তাওবাকারী ব্যক্তিই সফলতার আশা করতে পারে, অন্য কেউ নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, আমীন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿١١﴾

"যারা তাওবা করে না তারাই জালিম বা অত্যাচারী।"[১৩]

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন : তাওবাকারী ও জালিম; এখানে তৃতীয় কোনো শ্রেণি নেই। যারা তাওবা করে না তাদেরকে তিনি জালিম বলেছেন। আসলে তার চেয়ে জালিম আর কেউ নেই। কারণ সে তার রব সম্পর্কে, রবের হক সম্পর্কে, নফসের দোষত্রুটি সম্পর্কে এবং তার আমলের কমতি ও বিপদাপদ সম্পর্কে অজ্ঞ, অকাট মূর্খ।

'সহীহ মুসলিম'-এ এসেছে, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا إِلَى اللهِ فَإِنِّيْ أَتُوْبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ

"ওহে লোকসকল, তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করো। আমি তো আল্লাহর নিকট প্রতিদিন একশ বার তাওবা করি।"[১৪]

---

[১২] সূরা নূর, ২৪ : ৩১।

[১৩] সূরা হুজুরাত, ৪৭ : ১১।

২ নং মানযিল : আল্লাহ-অভিমুখী হওয়া (اَلْإِنَابَةُ)

যখন তাওবার মানযিলে বান্দার পা স্থির হয়ে যায় তখন সে ইনাবাত বা আল্লাহ দিকে ধাবিত হওয়ার মানযিলে অবতরণ করে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে এর আদেশ করেছেন এবং এই গুণের কারণে তিনি তাঁর খলীল ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَنِيْبُوْا إِلَىٰ رَبِّكُمْ

"তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও।"[১৫]

তিনি আরও বলেন,

إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ لَحَلِيْمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ﴿٧٥﴾

"নিশ্চয় ইবরাহীম বড়োই ধৈর্যশীল, কোমল হৃদয়, আল্লাহ-অভিমুখী ছিল।[১৬]"

আল্লাহ তাআলা আরও জানিয়ে দিয়েছেন যে, কেবল আল্লাহ-অভিমুখী ব্যক্তিরাই তাঁর নিদর্শনাদি যথাযথভাবে উপলব্ধি করে এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। তিনি বলেন,

هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ﴿١٣﴾

"তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলি দেখান এবং তোমাদের জন্য আসমান থেকে নাযিল করেন রিয্ক। (কিন্তু এসব নিদর্শন দেখে) কেবল তারাই শিক্ষা গ্রহণ করে যারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।"[১৭]

আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ-অভিমুখীদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। তিনি বলেন,

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ أَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَأَنَابُوْا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۚ

"যারা তাগূত বা শয়তানি শক্তির পূজা-অর্চনা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ-অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ।"[১৮]

---

[১৪] মুসলিম, ২৭০২।
[১৫] সূরা যুমার, ৩৯ : ৫৪।
[১৬] সূরা হূদ, ১১ : ৭৫।
[১৭] সূরা গাফির, ৪০ : ১৩।

ইনাবাত বা আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া দুই প্রকার :

একটি হলো আল্লাহ তাআলার রুবূবিয়্যাতের দিকে ধাবিত হওয়া : এটি সমস্ত মাখলূকাতের ইনাবাত; যাতে মুমিন-কাফির, ভালো-মন্দ সবাই শামিল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِيْنَ إِلَيْهِ

"মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তারা তাদের পালনকর্তাকে আহ্বান করে তাঁরই অভিমুখী হয়ে।"[১৯]

আসলে এটি প্রত্যেক বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সত্য। তবে এই ধাবমানতার জন্য ইসলাম গ্রহণ জরুরি না; কাফির-মুশরিকরাও তো দুর্যোগ-দুর্দশায় পড়লে আল্লাহকেই ডাকতে থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার ইনাবাত হলো আল্লাহর ওলিদের ইনাবাত। এটি হলো আল্লাহর ইলাহিয়্যাতের প্রতি দাসত্ব ও মহাব্বতের সাথে তাঁর দিকে ধাবিত হওয়া। এটি চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে : ১. তাঁর ভালোবাসা, ২. তাঁর সামনে বিনয়ী হওয়া, ৩. তাঁর অভিমুখী হওয়া এবং ৪. তাঁকে ছাড়া সবকিছুকে উপেক্ষা করা। সুতরাং কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ-অভিমুখী (اَلْمُنِيْبُ) বলে সাব্যস্ত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত-না সে এই চারটি গুণে গুণান্বিত হয়।

সালাফগণ ইনাবাতের যে তাফসীর করে থাকেন তা এই চারটি বিষয়ের মধ্যেই আবর্তিত হয়। ইনাবাতের অর্থের মধ্যে দ্রুততা, ফিরে আসা ও অগ্রসর হওয়ার অর্থ পাওয়া যায়। সুতরাং মুনীবের অর্থ হয় যে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির দিকে দ্রুত ধাবিত হয়, সবসময় তাঁর দিকে ফিরে এবং তাঁর পছন্দনীয় বিষয়াদির দিকে অগ্রসর হয়।

৫ নং মানযিল : পলায়ন করা (اَلْفِرَارُ)

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾-এর একটি মানযিল হলো—পলায়ন করার মানযিল।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَفِرُّوْا إِلَى اللهِ ۖ

---

[১৮] সূরা যুমার, ৩৯ : ১৭।
[১৯] সূরা রূম, ৩০ : ৩৩।

“অতএব, তোমরা আল্লাহর দিকে পালাও।”[২০]

‘ফিরার’ বা পলায়ন করার প্রকৃত অর্থ হলো : এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুর দিকে ছোটা। এটি দুই প্রকার : সৌভাগ্যবানদের পলায়ন এবং দুর্ভাগ্যবানদের পলায়ন।

সৌভাগ্যবানদের পলায়ন : আল্লাহর দিকে পলায়ন করা।

দুর্ভাগ্যবানদের পলায়ন : আল্লাহর দিকে নয়, বরং আল্লাহ থেকে পলায়ন করা।

আর আল্লাহর থেকে পালিয়ে আল্লাহর দিকেই যাওয়া—এটি হলো তাঁর নৈকট্যভাজন ওলিদের পলায়ন।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) ওপরের আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ‘তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে তাঁর দিকেই ছুটে যাও এবং তাঁর আনুগত্য করতে থাকো।’

সাহ্‌ল ইবনু আবদিল্লাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর সবার কাছ থেকে পালিয়ে আল্লাহর দিকেই যাও।’

অন্যান্যরা বলেছেন, ‘আল্লাহর শাস্তি থেকে পালিয়ে ঈমান ও আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর সাওয়াবের দিকে দ্রুত ধাবিত হও।’

মূর্খতা থেকে জ্ঞানের দিকে ধাবিত হওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত। জাহ্‌ল বা মূর্খতা দুই প্রকার : ১. উপকারী সত্য সম্পর্কে না জানা এবং ২. সে অনুযায়ী আমল না করা। শাব্দিক, পারিভাষিক, শারঈ ও প্রকৃত অবস্থার বিচারে উভয়টিই মূর্খতা।

মূসা (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

أَعُوْذُ بِاللهِ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ﴿٦٧﴾

“মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”[২১]

মূসা (আলাইহিস সালাম) এই কথা বলেছিলেন তখন যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল,

أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ

“তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছো?”[২২]

---

[২০] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৫০।
[২১] সূরা বাকারা, ২ : ৬৭।
[২২] সূরা বাকারা, ২ : ৬৭।

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾

"আপনি যদি তাদের চক্রান্ত আমার ওপর থেকে প্রতিহত না করেন, তা হলে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।"[২৩]

অর্থাৎ তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব যারা হারাম কাজে লিপ্ত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ

"অবশ্যই আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন, যারা মূর্খতাবশত মন্দ কাজ করে।"[২৪]

কাতাদা (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'সাহাবায়ে কেরাম একমত পোষণ করেছেন যে, যার দ্বারা আল্লাহর নাফরমানি করা হয় তা-ই মূর্খতা।'

অনেকেই বলেছেন, 'সাহাবায়ে কেরামের ইজমা সংঘটিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তিই আল্লাহর নাফরমানি করে সে-ই মূর্খ বা জাহিল।'

ইলমের মূল্যায়ন না করাকে মূর্খতা বলে নামকরণ করা হয়েছে; হয়তো ইলম দ্বারা উপকৃত না হওয়ার কারণে অথবা তার কৃতকাজের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে।

উল্লেখিত পলায়ন বা ফিরার এই দুই প্রকার মূর্খতা থেকে পলায়নকেও শামিল করে। অর্থাৎ বিশ্বাস, প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টিগতভাবে ইলম সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকে ইলম হাসিল করার দিকে পলায়ন করা। এমনিভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে ও মেহনত করার মাধ্যমে আমল না করার মূর্খতা থেকে উপকারী পরিশ্রম ও নেক আমল করার দিকে পলায়ন করা ।

এমনিভাবে অলসতার আহ্বানে সাড়া দেওয়া থেকে আমল ও পরিশ্রমের ডাকে সাড়া দেওয়ার দিকে পালিয়ে যাওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত।

এখানে পরিশ্রম বলতে সংকল্পের সততা এবং নিস্তেজ-নিষ্প্রাণ না হওয়া, খাটো করে দেখা ও বিলম্বকরণের অজুহাত থেকে বেঁচে থাকা। এই অজুহাত 'শীঘ্রই করব', 'অচিরেই করব', 'দেখা যাক', 'আশা আছে'—এ শব্দাবলির অধীন। এটি হলো বান্দার জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর। এটি এমন একটি গাছ, যার ফল কেবল ক্ষতি আর আফসোস।

---

[২৩] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৩৩।

[২৪] সূরা নিসা, ৪ : ১৭।

এর মধ্যে এটিও শামিল যে, বিভিন্ন কারণে চিন্তা, পেরেশানি, ভয়ভীতি বান্দাকে এই দুনিয়াতে যে কষ্ট দেয় এবং ধনসম্পদ, শরীর, পরিবার, বন্ধুবান্ধব, শত্রু ইত্যাদি ক্ষেত্রেও যে কষ্ট পায় তার কারণে হৃদয়ে যে সংকীর্ণতা আসে তা থেকে আল্লাহ তাআলার ওপর নির্ভরতার প্রশস্ত ময়দানের দিকে, তাঁর ওপর প্রকৃত তাওয়াক্কুল, তাঁর প্রতি উত্তম আশা, তাঁর দয়া, অনুগ্রহ ও করুণা প্রাপ্তির প্রত্যাশা করার দিকে অগ্রসর হওয়া। সাধারণ মানুষের এই কথাটি সবচেয়ে উত্তম, 'আল্লাহ সাথে থাকলে কোনো চিন্তা নেই। রাখে আল্লাহ মারে কে?'

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ

"আর যে আল্লাহকে ভয় করে চলে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ বের করে দেবেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিয্ক দান করবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না।"[২৫]

রবী' ইবনু খুসাইম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'মানুষের ওপর যত ধরনের সংকীর্ণতা আসতে পারে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় তিনি সৃষ্টি করে দেবেন।'

আবুল আলিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'প্রতিটি বিপদাপদ থেকে তিনি নিষ্কৃতির পথ বাতলে দেবেন।'

এটি দুনিয়া ও আখিরাতের সব ধরনের বিপদাপদ ও সংকীর্ণতা থেকে নিষ্কৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ আল্লাহ তাআলা মুত্তাকী খোদাভীরুদের জন্য দুনিয়া কিংবা আখিরাত কোনোটিকে নির্দিষ্ট করে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করেননি।

বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার প্রতি উত্তম ধারণা রাখবে, তার নিকট উত্তম আশা পোষণ করবে এবং সত্যিকারার্থে তাঁর ওপর ভরসা করবে তখন নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ তাআলা তার আশা-ভরসাকে বিফল হতে দেবেন না। কারণ, আল্লাহ কোনো আশাপোষণকারীর আশাকে নিরাশায় পরিণত করেন না এবং কোনো আমলকারীর আমলকে বিনষ্টও করেন না। তাঁর ওপর নির্ভরতা ও তাঁর প্রতি উত্তম ধারণাকে তিনি প্রশস্ততা বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা ঈমানের পর তাঁর ওপর নির্ভরতা, তাঁর নিকট ভালো আশা করা এবং তাঁর প্রতি উত্তম ধারণা রাখার চেয়ে হৃদয়ের জন্য বেশি উন্মুক্ত ও প্রশস্ততম আর কিছু নেই।

*****

১২ নং মানযিল : দুনিয়াবিমুখতা (اَلزُّهْدُ)

[২৫] সূরা তালাক, ৬৫ : ২-৩।

দুনিয়াবিমুখতার পরিচয়

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾-এর আরেকটি মানযিল হলো—দুনিয়াবিমুখতার মানযিল।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ ۖ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ ۗ

"তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে, তা কখনো শেষ হবে না।"[২৬]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

اِعْلَمُوْا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿٢٠﴾

"তোমরা জেনে রাখো, পার্থিব জীবন ক্রীড়াকৌতুক, সাজসজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য অন্বেষণ ব্যতীত আর কিছু নয়, যেমন বৃষ্টি, যার (মাধ্যমে উদ্‌গত) সবুজ ফসল কৃষকদের চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে হলুদ বর্ণের দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে (একদিকে) আছে কঠিন শাস্তি এবং (অপরদিকে) আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।"[২৭]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

"এ ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দুনিয়ার জীবনের একটি সাময়িক সৌন্দর্যশোভা মাত্র এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদানপ্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্য উত্তম।"[২৮]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَّأَبْقَى ﴿١٧﴾

---

[২৬] সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ৯৬।
[২৭] সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২০।
[২৮] সূরা কাহ্‌ফ, ১৮ : ৪৬।

"বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।"[২৯]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾

"আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিবজীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগবিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি উঠাবেন না। আপনার পালনকর্তার দেওয়া জীবনোপকরণই উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।"[৩০]

দুনিয়াবিমুখতা, দুনিয়ার তুচ্ছতা, স্বল্পতা, ক্ষণস্থায়িত্ব, এর দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাওয়া, আখিরাতের প্রতি আগ্রহী হওয়া, আখিরাতের মর্যাদা, স্থায়িত্ব আর তার দ্রুত আগমন ইত্যাদির আলোচনায় কুরআন পরিপূর্ণ ও ভরপুর। আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দার কল্যাণ কামনা করেন তখন তার অন্তরে একজন প্রহরী নিযুক্ত করে দেন, যার সাহায্যে সে দুনিয়া-আখিরাতের প্রকৃত অবস্থা দেখতে পায় এবং এ দুটির মধ্যে যেটি প্রাধান্য পাওয়া দরকার সেটিকে প্রাধান্য দেয়।

অধিকাংশ মানুষ যুহ্দের ব্যাপারে নিজের পছন্দ-অপছন্দ, অবস্থা ও অভিজ্ঞতার আলোকে কথা বলেছেন। তবে এর চেয়ে ইলমি আলোচনা করাই উত্তম ও ফলপ্রসূ হবে। কারণ তা হবে দলীল-প্রমাণ সমৃদ্ধ।

আমি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'যুহ্দ বা দুনিয়াবিমুখতা হলো আখিরাতে যা উপকারে আসবে না তা পরিত্যাগ করা। আর আল্লাহর ভয় হলো আখিরাতে যার ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে তাতে জড়িয়ে না পড়া।'

এই কথাটি দুনিয়াবিমুখতা ও ভয় সম্পর্কে যা বলা হয়েছে সেগুলো মধ্যে সর্বোত্তম ও ব্যাপক অর্থবোধক কথা।

সুফ্ইয়ান সাওরি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'দুনিয়াবিমুখতা হচ্ছে আশাকে ছোটো রাখা। এটি মোটা খাবার খাওয়া আর আবা-জোব্বা পরিধান করার নাম নয়।'

জুনাইদ বাগদাদি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'আমি সারি সাকাতি (রহিমাহুল্লাহ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে দুনিয়াকে ছিনিয়ে নিয়েছেন, এর থেকে তাঁর অতি কাছের লোকদেরকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর মহাব্বতের অধিকারী ব্যক্তিদের অন্তর থেকে তা বের করে দিয়েছেন। কারণ তিনি তাদের জন্য তা পছন্দ করেননি, এতে তিনি সন্তুষ্ট হননি।'

কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে যুহ্দের প্রকৃত অর্থ নিহিত রয়েছে—

---

[২৯] সূরা আ'লা, ৮৭ : ১৬-১৭।

[৩০] সূরা ত্ব-হা, ২০ : ১৩১।

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا آتَاكُمْ ۗ

"(এটা এজন্য বলা হলো,) যাতে তোমাদের যা হাতছাড়া হয়ে যায় তার কারণে তোমরা দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, সে জন্য গর্বিতও না হও।"[৩১]

সুতরাং বলা যায়, যাহিদ হলো সেই ব্যক্তি যে দুনিয়ার কোনোকিছু পেয়ে আনন্দ-উল্লাসও করে না আবার এর কোনোকিছু না পেলে হতাশা ও বিষণ্ণতায়ও ভোগে না।

ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুআয (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'যুহ্দ নিজ মালিকানাকে দান করতে উদ্বুদ্ধ করে আর মহাব্বত আপন রূহকে দান করতে উদ্বুদ্ধ করে।'

ইবনুল জালা (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'যুহ্দ হলো দুনিয়ার দিকে ধ্বংসের দৃষ্টিতে তাকানো, ফলে তা তোমার চোখে ছোটো ও হীন হয়ে ধরা দেবে, ফলে দুনিয়া থেকে দূরে থাকা তোমার জন্য জন্য সহজ হবে।'

ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'দুনিয়াবিমুখতা হলো ছোটো আশা পোষণ করা।'

তাঁর থেকে আরেকটি কথা বর্ণিত আছে, সেটা হলো দুনিয়া কারও কাছে হাজির হলে আনন্দিত না হওয়া এবং হাতছাড়া হয়ে গেলে পেরেশান ও হয়রানও না হওয়া। কারণ তাকে একজন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যার সাথে একহাজার দীনার ছিল, সে কি দুনিয়াবিমুখ যাহিদ হতে পারবে? তিনি জবাব দেন, 'হ্যাঁ, একটি শর্তে হতে পারবে, তা হলো এই সম্পদের চেয়ে যদি তার আরও সম্পদ বেড়ে যায় তা হলে সে আনন্দিত হবে না আবার যদি এর থেকে কমে যায় তা হলে সে দুঃখও পাবে না।'

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'এটি হলো অভাবের প্রতি ভালোবাসার সাথে আল্লাহর ওপর নিশ্চিন্ত নির্ভরতা।' এটি শাকীক বালখি ও ইউসুফ ইবনু আসবাত (রহিমাহুমাল্লাহ)-এরও কথা।

আবূ সুলাইমান দারানি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'যা আল্লাহ থেকে দূরে রাখে তা পরিত্যাগ করা।' এটি শিবলি (রহিমাহুল্লাহ)-এরও কথা।

রুওয়াইম (রহিমাহুল্লাহ) জুনাইদ বাগদাদি (রহিমাহুল্লাহ)-কে দুনিয়াবিমুখতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দেন, 'দুনিয়াকে অপদস্থ, হীন ও ছোটো মনে করা এবং অন্তর থেকে তার প্রভাব মিটিয়ে দেওয়া।'

একব্যক্তি ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুআয (রহিমাহুল্লাহ)-কে বললেন, 'কখন আমি তাওয়াক্কুলের পানশালায় প্রবেশ করব, দুনিয়াবিমুখদের পোশাক পরিধান করব এবং তাদের সাথে উপবেশন করব?' জবাবে তিনি বললেন, 'যখন তুমি তোমার নফসের ওপর সাধনা করতে করতে এই পর্যায়ে পৌঁছাবে যে, আল্লাহ তাআলা যদি তোমার নিকট থেকে তিন দিন রিয্ক বন্ধ করে রাখেন তা হলেও তোমার নফস দুর্বল হয়ে পড়বে না।

[৩১] সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২৩।

আর তুমি যদি এই স্তরে না পৌঁছেই তাদের সারিতে বসে পড়ো তা হলে তা হবে তোমার মূর্খতা ও অজ্ঞতা, তখন তোমার লাঞ্ছিত হওয়ার ব্যাপারে আমি নিরাপদ নই।'

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'যুহ্দ হলো তিন প্রকার :

১. হারাম পরিত্যাগ করা; এটি হলো সাধারণ লোকদের যুহ্দ।
২. হালাল বস্তুর মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার পরিত্যাগ করা; এটি হলো বিশেষ ব্যক্তিদের যুহ্দ।
৩. যা আল্লাহ থেকে বিমুখ করে তা পরিত্যাগ করা; এটি হলো আল্লাহর মা'রিফাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের যুহ্দ।

ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ)-এর এই বাণী পূর্বে উল্লেখিত সালাফদের সমস্ত বাণীকে অন্তর্ভুক্ত করে। সেগুলোর পাশাপাশি এর বিস্তারিত বিবরণ ও স্তরের বর্ণনাও এতে রয়েছে। এটি হলো ব্যাপক অর্থবহ কথা। এটি এ ব্যাপারেও ইঙ্গিত প্রদান করে যে, তিনি এই বিষয়ে অনেক উঁচু স্তরের ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ইমাম শাফিয়ি (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ব্যাপারে এই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি আটটি বিষয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন। তার মধ্যে একটি হলো যুহ্দ বা দুনিয়াবিমুখতা।

২৭ নং মানযিল : শোকর (اَلشُّكْرُ)

শোকর আদায়ে উৎসাহদান

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾-এর আরেকটি মানযিল হলো—শোকরের মানযিল।

এটি সর্বশেষ্ঠ মানযিলগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি মানযিল। রিযা বা সন্তুষ্টির মানযিলের চেয়ে উচ্চ স্তরের মানযিল হলো শোকরের মানযিল। কেননা শোকর সন্তুষ্টির সাথে সাথে আরও অতিরিক্ত গুণাবলিকেও ধারণ করে। আর রিযা বা সন্তুষ্টি হলো শোকরের অন্তর্ভুক্ত। কারণ সন্তুষ্টি ব্যতীত শোকরের অস্তিত্ব অসম্ভব।

শোকর হলো ঈমানের অর্ধেক। যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ঈমানের দুটি অংশ—

১. শোকর বা কৃতজ্ঞতা এবং
২. সবর বা ধৈর্য ধারণ করা।

আল্লাহ তাআলা শোকরের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদির আদেশ করেছেন এবং এর বিপরীত বিষয়াবলি থেকে নিষেধ করেছেন। শোকরগুজার বান্দাদের প্রশংসা করেছেন, তাঁর খাছ খাছ বান্দাদের শোকরের গুণে গুণান্বিত করেছেন, শোকরকে তাঁর সৃষ্টি ও আদেশদানের উদ্দেশ্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন, কৃতজ্ঞ বান্দাদের

উত্তম প্রতিদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, শোকরকে তাঁর অধিক অনুগ্রহ লাভের মাধ্যম বানিয়েছেন, তাঁর নিয়ামাতরাজি সংরক্ষণের জন্য প্রহরী ও পর্যবেক্ষক সাব্যস্ত করেছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর নিদর্শনাবলি থেকে কেবল শোকরগুজার বান্দারাই উপকৃত হয়ে থাকে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর সুমহান নামসমূহ থেকে শোকর আদায়কারী (اَلشَّاكِرُ) বান্দাদের নামকরণ করেছেন। কেননা আল্লাহ তাআলার পবিত্র নামসমূহের একটি নাম হলো 'আশ-শাকূর' (اَلشَّكُوْرُ)। যার অর্থ—যিনি শোকরগুজার ব্যক্তিকে তার প্রশংসাকৃত বস্তু পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন। বরং আল্লাহ তাআলা তো শাকির বা শোকরগুজার বান্দাকে তার প্রশংসাকৃত বস্তু দেওয়ার ওয়াদা পর্যন্ত করেছেন। আর তা হলো—বান্দার ওপর তার মহান রবের চূড়ান্ত সন্তুষ্টি। কিন্তু আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শোকরগুজার বান্দা খুবই কম।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١١٤﴾

"আল্লাহর দেওয়া অনুগ্রহের শোকর আদায় করো, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদাত করে থাকো।"[৩২]

তিনি আরও বলেন,

وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ﴿١٥٢﴾

"আর তোমরা আমার শোকর আদায় করো এবং আমার অকৃতজ্ঞ হোয়ো না।"[৩৩]

তিনি আরও বলেন,

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ﴿٧﴾

"তোমরা যদি শোকর আদায় করো, তা হলে আমি তোমাদের আরও বাড়িয়ে দেবো আর যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে বড়োই কঠোর।"[৩৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٥﴾

---

[৩২] সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ১১৪।
[৩৩] সূরা বাকারা, ২ : ১৫২।
[৩৪] সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৭।

“নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল শোকরগুজার বান্দাদের জন্য রয়েছে বহু নিদর্শন।”[৩৫]

আল্লাহ তাআলা নিজের নামকরণ করেছেন—শাকির (اَلشَّاكِرُ), শাকূর (اَلشَّكُوْرُ) দ্বারা। আর কৃতজ্ঞ বান্দাদেরও এই দুই নামে নামকরণ করেছেন। নিজের গুণাবলি দ্বারা তাঁদেরকে গুণান্বিত করেছেন এবং নিজের নামে তাঁদের নাম দিয়েছেন। সুতরাং শোকরগুজার ব্যক্তি আপনার ভালোবাসা ও উদারতা পাওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট।

আল্লাহ তাআলা শোকরকারীদের প্রচেষ্টার উত্তম বিনিময় দান করবেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿٢٢﴾

“নিঃসন্দেহে এটি হচ্ছে তোমাদের জন্য পুরস্কার, আর তোমাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃত হয়েছে।”[৩৬]

শোকরের মাঝে আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ

“যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তা হলে এতে তিনি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।”[৩৭]

আর পৃথিবীতে শোকরকারী বান্দা কম, এটিই ইঙ্গিত প্রদান করে যে, তাঁরা আল্লাহ তাআলার বিশেষ বান্দা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ﴿١٣﴾

“আমার বান্দাদের মধ্যে শুকরিয়া আদায়কারী বান্দা খুবই কম।”[৩৮]

আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে দাঁড়িয়ে এত অধিক পরিমাণ সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর দুই পা ফুলে গিয়েছিল। ফলে তাঁকে বলা হলো, আপনি এভাবে আমল করছেন, অথচ আল্লাহ তাআলা আপনার আগে-পরের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন! জবাবে তিনি বলেন, ‘আমি কি শোকরগুজার বান্দা হব না?’[৩৯]

---

[৩৫] সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৫।
[৩৬] সূরা ইনসান, ৭৬ : ২২।
[৩৭] সূরা যুমার, ৩৯ : ৭।
[৩৮] সূরা সাবা, ৩৪ : ১৩।
[৩৯] বুখারি, ৪৮৩৭; মুসলিম, ২৮২০।

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন মুআয ইবনু জাবাল (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেন, 'আল্লাহর শপথ! হে মুআয, অবশ্যই আমি তোমাকে ভালোবাসি। প্রত্যেক ওয়াক্ত সালাতের পরে (এই দুআটি) পাঠ করতে ভুলে যেয়ো না—

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

'হে আল্লাহ, আমাকে আপনার স্মরণে, আপনার শোকর আদায়ে এবং আপনার উত্তম ইবাদাতে আমাকে সাহায্য করুন।'[৪০]

৩০ নং মানযিল : অপরকে প্রাধান্য দেওয়া (اَلْإِيْثَارُ)

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾-এর আরেকটি মানযিল হলো—অপরকে প্রাধান্য দেওয়ার মানযিল।

আল্লাহ তাআলা নিজের ওপর অপরকে প্রাধান্য দানকারীর প্রশংসা করে বলেন,

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٩﴾

"এবং নিজেরা যত অভাবগ্রস্তই হোক না কেন তারা নিজেদের চেয়ে অন্যদের প্রাধান্য দিয়ে থাকে। মূলত যেসব লোককে তার মনের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে তারাই সফলকাম।"[৪১]

اَلْإِيْثَارُ 'অপরকে প্রাধান্য দেওয়া' হলো اَلشُّحُّ 'লোভ'-এর বিপরীত। কারণ নিজের ওপর অপরকে প্রাধান্য দানকারী ব্যক্তি তার প্রয়োজনীয় জিনিস পরিত্যাগ করে। আর লোভী ব্যক্তি অপরের জিনিসে আকাঙ্ক্ষা করে। যদি অপরের কোনো জিনিস তার হাতে আসে তবে সে লোভে পড়ে যায় এবং তা বের করতে কৃপণতা করে। কৃপণতা হলো লোভের ফল। লোভ কৃপণতা করার আদেশ দেয়। যেমন নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوْا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيْعَةِ فَقَطَعُوْا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُوْرِ فَفَجَرُوْا

"তোমরা লোভ থেকে বেঁচে থেকো। কেননা লোভের কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। লোভ তাদেরকে কৃপণতা করতে আদেশ দিত, ফলে তারা কৃপণতা করত; তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন

[৪০] আবূ দাঊদ, ১৫২২, সহীহ।
[৪১] সূরা হাশর, ৫৯ : ৯।

করতে বলত, তারা তা ছিন্ন করত এবং তাদেরকে অপকর্ম করতে নির্দেশ দিত, ফলে তারা অপকর্মে লিপ্ত হতো।”[৪২]

সুতরাং কৃপণ হলো সেই ব্যক্তি যে লোভের আহ্বানে সাড়া দেয়। আর অপরকে প্রাধান্য দানকারী হলো সেই ব্যক্তি যে বদান্যতা ও উদারতার আহ্বানে সাড়া দেয়।

এমনিভাবে প্রকৃত দানশীলতা হলো অপরের সম্পদে লোভনীয় দৃষ্টি না দেওয়া। এটি নিজ হাতে খরচ করার চেয়েও উত্তম দানশীলতা।

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘অপরের সম্পদে লোভ করা থেকে বিরত থাকা ধনসম্পদ দান করার চেয়েও উত্তম।’[৪৩]

৩৭ নং মানযিল : দৃঢ় বিশ্বাস (اَلْيَقِيْنُ)

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾-এর আরেকটি মানযিল হলো—দৃঢ় বিশ্বাসের মানযিল।

ঈমানের জন্য দৃঢ় বিশ্বাস হলো শরীরের জন্য আত্মার ন্যায়। এর মাধ্যমেই একজন অপরজনের ওপর মর্যাদা লাভ করে। এ ক্ষেত্রেই প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করে। এর প্রতিই আমলকারীদের পথচলা। দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সবাই আমল করে। প্রত্যেকের ইঙ্গিত এ দিকেই। আর যখন দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে ধৈর্য মিলিত হয় তখন এ দুয়ের মিলনে দ্বীনের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন হয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আর আল্লাহর কথার মাধ্যমেই পথপ্রাপ্তরা পথ পেয়ে থাকে—

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ۖ وَكَانُوْا بِآيَاتِنَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٢٤﴾

“আর যখন তারা ধৈর্য ধারণ করে এবং আমার আয়াতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে থাকে তখন তাদের মধ্যে এমন নেতা সৃষ্টি করে দিয়েছিলাম যারা আমার হুকুম অনুসারে পথপ্রদর্শন করত।”[৪৪]

আল্লাহ তাআলা দৃঢ় বিশ্বাসী বান্দাদের বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তারাই তাঁর নিদর্শনাদি ও দলীল-প্রমাণ দ্বারা উপকৃত হয়। মহাসত্যবাদী আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ﴿٢٠﴾

“দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে বহু নিদর্শন।”[৪৫]

---

[৪২] আবূ দাঊদ, ১৬৯৬, সহীহ।
[৪৩] ইবনু মানযূর, মুখতাসারু তারীখি দিমাশ্ক, ১৪/২৭।
[৪৪] সূরা সাজদা, ৩২ : ২৪।

আমলকারীদের মধ্য থেকে আল্লাহ তাআলা সফলতা ও হিদায়াতকে কেবল দৃঢ় বিশ্বাসীদের সাথে খাছ করেছেন। তিনি বলেছেন,

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾ أُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾

"আর যারা আপনার ওপর যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন) এবং আপনার আগে যেসব কিতাব নাযিল করা হয়েছিল সেগুলোর ওপর ঈমান আনে আর আখিরাতের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে হিদায়াতপ্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।"[৪৬]

সুতরাং ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাস হলো অন্তরের আমলসমূহের প্রাণ, যে আমলগুলো আবার বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলসমূহের প্রাণ। এটি সত্যবাদিতার হাকীকত। দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া সত্যবাদিতার মানযিল অস্তিত্বহীন।

অন্তরে যখন ইয়াকীন হাসিল হয় তখন তা নূর ও জ্যোতিতে ভরপুর হয়ে যায়। অন্তর থেকে সব ধরনের সন্দেহ, সংশয়, দুঃচিন্তা, পেরেশানি ও অন্ধকার দূর হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা, ভয়, সন্তুষ্টি, কৃতজ্ঞতা, তাঁর ওপর ভরসা ও তাঁর প্রতি আত্মনিবেদনে হৃদয়মন পূর্ণ হয়ে যায়। ইয়াকীনই হলো সমস্ত মর্যাদা ও সম্মান লাভের মৌলিক উপাদান।

৪২ নং মানযিল : জ্ঞান (اَلْعِلْمُ)

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾-এর আরেকটি মানযিল হলো—জ্ঞান বা ইলমের মানযিল।

আল্লাহর পথের পথিক তার পথচলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদি এই মানযিলের সাথে যুক্ত না থাকে তা হলে নিশ্চিতভাবে তার পথচলা হবে বিপথে ও ভ্রান্তপথে, সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। সফলতা ও হিদায়াতের পথ সে হারিয়ে ফেলবে এবং এর সমস্ত দরজা তার জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। মাশায়েখগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। আসলে আল্লাহর পথের চোর-ডাকাত-পথদস্যু আর শয়তানের প্রতিনিধিরা ছাড়া ইলম অর্জন করা থেকে আর কেউ বাধা দেয় না।

সূফিসম্রাট জুনাইদ ইবনু মুহাম্মাদ বাগদাদি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'সমস্ত মানুষের জন্য পথ বন্ধ। কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যথাযথ অনুসারীদের জন্য তা খোলা রয়েছে।'

তিনি আরও বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআন মুখস্থ করেনি এবং হাদীস লিখে রাখেনি সে এই পথে অনুসরণযোগ্য না। কারণ আমাদের ইলম কেবল কুরআন ও সুন্নাহর সাথেই সম্পৃক্ত।'

---

[৪৫] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ২০।

[৪৬] সূরা বাকারা, ২ : ৪-৫।

তিনি আরও বলেছেন, 'আমাদের এই পথ কুরআন-সুন্নাহর উসূল বা বিধিবিধানের সাথে শর্তযুক্ত।'

আবূ হাফস্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সর্বদা নিজের কাজকর্ম ও অবস্থাকে কুরআন-সুন্নাহের আলোকে যাচাই করে না এবং নিজের অন্তরকে পরীক্ষা করে না, তাকে সাধকপুরুষদের কাতারে গণ্য করা যায় না।'

আবূ সুলাইমান দারানি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'কখনো কখনো আমার অন্তরে অনেক ভালো ভালো কথার উদয় হয়, তবে আমি তা থেকে কেবল তখনই কোনোকিছু গ্রহণ করি যখন সেই ব্যাপারে দুই ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করে—কুরআন ও সুন্নাহ।'

আবূ ইয়াযীদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'আমি তিরিশ বছর সাধনা করেছি। কিন্তু ইলম ও ইলমসংক্রান্ত বিষয়াদির চেয়ে কঠিন কিছু পাইনি। যদি আলিমদের মতবিরোধ না থাকত তা হলে আমি সেখানেই পড়ে থাকতাম। উলামায়ে কেরামের মতবিরোধ হলো রহমতস্বরূপ; তবে তাওহীদের ক্ষেত্রে ব্যতীত।'

একদিন আবূ ইয়াযীদ (রহিমাহুল্লাহ) একজন যাহিদ বা দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তির সাক্ষাতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন তিনি মাসজিদে প্রবেশ করার সময় কিবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ করছেন। আবূ ইয়াযীদ (রহিমাহুল্লাহ) তখন (তার সাথে সাক্ষাৎ না করে) তাকে সালাম না দিয়েই ফিরে আসেন এবং বলেন, 'এই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদবসমূহের মধ্য থেকে একটি আদবের ব্যাপারেই বিশ্বস্ত নয়; সুতরাং তিনি যে বিষয়ের দাবি করছেন সে ক্ষেত্রে কীভাবে বিশ্বাসযোগ্য হবেন?'

তিনি আরও বলেছেন, 'একবার আমি ইচ্ছা করলাম আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করব যে, তিনি যেন আমাকে নারীর আকর্ষণ থেকে মুক্ত রাখেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো কীভাবে এমন প্রার্থনা করা আমার জন্য বৈধ হবে, আল্লাহ রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যার প্রার্থনা কখনো করেননি? এরপর আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে আমাকে নারীর আকর্ষণ থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। এমনকি এখন আমি কোনো পরোয়াই করি না যে, কোনো নারী আমাকে চুম্বন করল নাকি কোনো দেওয়াল!'

তিনি আরও বলেছেন, 'যদি তোমরা দেখো কোনো ব্যক্তিকে এমন কারামাত (অলৌকিক বিষয়) দান হয়েছে যে, তিনি শূন্যে উড়ছেন তবুও তোমরা তার মাধ্যমে ধোঁকায় পোড়ো না। যতক্ষণ-না তোমরা তার দ্বীনদারি, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও শারীআত পালনে তার অবস্থান যাচাই করে নাও।'

আবূ হামযা বাগদাদি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সত্য পথ সম্পর্কে অবগত হয় তার জন্য পথচলা সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার নিকট এ পথের কেবল একটিই নিদর্শন; আর তা হলো : প্রতিটি কথা, কাজে ও পরিস্থিতিতে রাসূলুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণ করা।'

৪৭ নং মানযিল : ভালোবাসা (اَلْمَحَبَّةُ)

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾-এর আরেকটি মানযিল হলো—ভালোবাসা বা মহাব্বতের মানযিল।

এটি এমন এক মানযিল যা অর্জন করতে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতায় নামে, আমলকারীরা এর দিকেই মুখিয়ে থাকে, অগ্রগামীরা এর প্রতিই তাদের যাত্রা অব্যাহত রাখে, এর ওপরেই প্রেমিকরা তাদের জীবন উৎসর্গ করে আর এর সজীবতাতেই ইবাদাতকারীরা হয়ে ওঠে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। ভালোবাসা হলো অন্তরের শক্তি, আত্মার খোরাক, চোখের প্রশান্তি। এটিই মানুষের সেই প্রাণশক্তি, যা থেকে কেউ বঞ্চিত হলে সে মৃতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এটি এমন এক আলো, যে তা হারিয়ে ফেলে সে অন্ধকারের সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। এটি এমন এক ওষুধ, যে এর সেবন থেকে বিরত থাকে রাজ্যের সমস্ত অসুখ তার অন্তরে এসে বাসা বাঁধে। এটি এমন স্বাদের, যে তা আস্বাদন করে না পুরা জীবনটাই তার ব্যথা-বেদনা আর যন্ত্রণায় ভরে ওঠে।

মহাব্বত হলো হলো ঈমান, আমল ও উচ্চ মর্যাদাসমূহের প্রাণ। যখন এগুলো ভালোবাসা-শূন্য হয় তখন সেগুলো প্রাণহীন দেহের ন্যায় নির্জীব ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

আল্লাহর শপথ! মহাব্বতকারীরা দুনিয়া ও আখিরাতের সব মর্যাদা ও সম্মান অর্জন করে নিয়েছে। কারণ তাদের জন্য রয়েছে তাদের মাহবূব স্বয়ং সুমহান আল্লাহর নৈকট্য। কেননা আল্লাহ তাআলা সবকিছু সৃষ্টি করার সময় এই ফায়সালা করে রেখেছেন যে, যে যাকে ভালোবাসবে সে তার সঙ্গী হবে। সুতরাং মহাব্বতকারীদের জন্য কত উত্তম নিয়ামাতই না অপেক্ষা করছে!

ভালোবাসার সংজ্ঞা (تَعْرِيْفُ الْمَحَبَّةِ)

মহাব্বত বা ভালোবাসাকে কোনো সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা যায় না। এ ক্ষেত্রে সংজ্ঞা কেবল অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতাই বৃদ্ধি করে।

মানুষ ভালোবাসার কারণ, অনুঘটক, আলামত, দৃষ্টান্ত, ফলাফল ও হুকুম-আহকাম নিয়ে আলোচনা করে থাকে। তাদের দেওয়া সংজ্ঞা ও তা'রীফ এই ছয়টি বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। তবে বিভিন্ন ভঙ্গি ও উপস্থাপনায় বিভিন্ন রকম অভিমত উঠে আসে। আসলে সবাই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা, মর্যাদা আর যোগ্যতা অনুসারেই এ ব্যাপারে কথা বলে।

মহাব্বত সৃষ্টির কারণসমূহ

দশটি বিষয় আল্লাহর প্রতি মহাব্বত সৃষ্টি করে :

এক. অর্থসহ কুরআন তিলাওয়াত করা এবং তাতে কী বোঝানো হয়েছে তা গভীরভাবে চিন্তাভাবনা-সহ অধ্যয়ন করা। যেমন কেউ কোনো কিতাব অধ্যয়ন করতে গিয়ে চিন্তা-ফিকির করে শরাহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ দেখে বোঝার চেষ্টা করে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছে!

দুই. ফরজ আমলসমূহ আদায়ের পর নফল আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার চেষ্টা করা। কারণ এটি বান্দাকে প্রেমিকের স্তর থেকে প্রেমাষ্পদের স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়। অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই তাকে ভালোবাসতে শুরু করেন।

তিন. জবান, অন্তর ও আমলের মাধ্যমে সবসময় আল্লাহর যিক্‌র করা। কারণ বান্দা যতটুকু যিক্‌র করে আল্লাহর সাথে তার ততটুকুই মহাব্বত সৃষ্টি হয়।

চার. কষ্টকর হলেও আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয়গুলোকে নিজের পছন্দনীয় বিষয়াদির ওপর প্রাধান্য দেওয়া। নিজের নফসের খাহেশাতকে দমিয়ে রাখা।

পাঁচ. আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলি হৃদয়ঙ্গম করতে এবং এর প্রকৃত মর্ম ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে চেষ্টা-মেহনত করা। কারণ যে ব্যক্তি নাম ও গুণাবলিসহ আল্লাহ তাআলার পরিচয় পাবে সে অবশ্যই তাঁকে ভালোবাসবে।

ছয়. আল্লাহর দেওয়া প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমস্ত দয়া, অনুগ্রহ, রহমত ও নিয়ামাতকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করা। কারণ এই পর্যবেক্ষণ আল্লাহকে ভালোবাসতে উদ্‌বুদ্ধ করবে।

সাত. এটি হলো সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা। আল্লাহ তাআলার সামনে নিজের অন্তরকে ভেঙে একেবারে টুকরো টুকরো করে দেওয়া। এই বিষয়টি বর্ণনা করা যায় না। এটি আসলে অনুভবের বিষয়। লেখার ক্ষেত্রে তো কতগুলো অক্ষর ও শব্দ ছাড়া আর কিছুই দৃশ্যমান হয় না।

আট. বিশেষ বিশেষ রহমতের সময় যখন আল্লাহ তাআলা বান্দার খুব কাছাকাছি আসেন, তখন আল্লাহর সাথে নির্জনতা অবলম্বন করা। তাঁর প্রতি যিক্‌রে, মুনাজাতে, কুরআন তিলাওয়াতে নিমগ্ন হওয়া। পুরা সময়টা দেহমন উপস্থিত রেখে দাসত্বের আদাব বা শিষ্টাবলি পরিপূর্ণভাবে মেনে তাঁর অভিমুখী হওয়া এবং ইস্‌তিগফার ও তাওবার মাধ্যমে এই বিশেষ সময়গুলো অতিবাহিত করা।

নয়. সত্যবাদী ও আল্লাহপ্রেমিকদের সাথে উঠাবসা করা এবং তাঁদের সান্নিধ্যে থাকা। তাঁদের বাণীসমূহ থেকে উত্তম উত্তম বাণীগুলোকে নিজের পাথেয় হিসেবে সংগ্রহ করা; যেমন ফল সংগ্রহ করার সময় যেগুলো ভালো আমরা কেবল সেগুলোই সংগ্রহ করি। তাঁদের মজলিসে তীব্র প্রয়োজন ছাড়া কথা না বলা। যদি কথা বলায় নিজের ও অপরের উপকার হয় তবেই কথা বলা।

দশ. যে সমস্ত কারণ আল্লাহ তাআলার মাঝে ও বান্দার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সেগুলো থেকে প্রাণপণে বেঁচে থাকা।

উপরিউক্ত দশটি কারণ মানুষকে আল্লাহর মহাব্বত বা ভালোবাসার মানযিলে পৌঁছিয়ে দেয় এবং এর দ্বারা ব্যক্তি আল্লাহর প্রেমিকদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সবগুলোর মূল ও ভিত্তি হলো দুইটি বিষয় : এর জন্য অন্তরকে প্রস্তুত করা এবং চোখ-কান খোলা রাখা। সাহায্য-লাভের উৎস শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলা।

(৫৮) অধ্যায় : তাওহীদ বা একত্ববাদ (اَلتَّوْحِيْدُ)

তাওহীদ হলো নবি-রাসূলগণের সর্বপ্রথম দাওয়াত, সমস্ত মানযিলের প্রথম মানযিল এবং আল্লাহর পথের পথিকদের শুরুর মাকাম।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ

"আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি। সে বলল : 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো ইলাহ্ নেই।'"[৪৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۖ

"আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ ইবাদাত করো এবং তাগূতের উপাসনা করা থেকে বেঁচে থাকো।"[৪৮]

তাওহীদের আহ্বানই হলো রাসূলদের দাওয়াতের চাবি। এ কারণেই নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দূত মুআয ইবনু জাবাল (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বলেছিলেন,

إِنَّكَ سَتَأْتِيْ قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلٰى أَنْ يَّشْهَدُوْا أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ...

"তুমি এমন সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ যারা আহলুল কিতাব। কাজেই তাদের কাছে যখন পৌঁছবে তখন তাদেরকে আহ্বান করবে তারা যেন সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয় তা হলে তাদের জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন।..."[৪৯]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

[৪৭] সূরা আ'রাফ, ৭ : ৫৯।
[৪৮] সুরা নাহ্ল, ১৬ : ৩৬।
[৪৯] বুখারি, ১৪৯৬; মুসলিম, ১৯।

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ،

"আমাকে আদেশ করা হয়েছে আমি যেন লোকদের সাথে লড়াই করতেই থাকি, যতক্ষণ পর্যন্ত-না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।"[৫০]

এই কারণে সঠিক অভিমত হলো মুকাল্লাফ বা শারঈ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির ওপর সর্বপ্রথম ওয়াজিব হলো : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ (আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ নেই)-এর সাক্ষ্য দেওয়া। চিন্তা-ফিকির করা কিংবা যুক্তি নয়। যেমনটি অজ্ঞ দার্শনিকরা বলে থাকেন।

সুতরাং তাওহীদ হলো ইসলামে প্রবেশের সর্বপ্রথম কথা আর দুনিয়া থেকে বের হওয়ার সর্বশেষ কথা। যেমন নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যার সর্বশেষ কথা হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৫১]

এটিই হলো সর্বপ্রথম ওয়াজিব আমল এবং এটিই হলো সর্বশেষ ওয়াজিব আমল। সুতরাং বলা যায়, তাওহীদই হলো বান্দার সবকিছুর শুরু ও শেষ।

তৃতীয় অধ্যায় : নির্বাচিত প্রবন্ধমালা

বিষয়বস্তুর সাথে মিল থাকার কারণে 'মাদারিজুস সালিকীন' গ্রন্থেরই বিভিন্ন জায়গায় লেখকের বিক্ষিপ্তভাবে আলোচিত বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ এই অধ্যায়ে সংযুক্ত করে দেওয়া হলো। আশা করি পাঠক এতে বেশ উপকৃত হবেন।

[৫০] বুখারি, ২৫; মুসলিম, ২২।
[৫১] আবূ দাউদ, ৩১১৬, সহীহ।

(৩) প্রবন্ধ : ‘নিশ্চিতভাবেই আমাকে তার কাছে পেতে’

‘সহীহ মুসলিম’-এর একটি হাদীসে এসেছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিয়ামাতের দিন বলবেন,

يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِيْ . قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوْدُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ . قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِيْ فُلَانًا مَّرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَّنِيْ عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اِسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِيْ . قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ . قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِيْ فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ يَا ابْنَ آدَمَ اِسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِيْ . قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيْكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اِسْتَسْقَاكَ عَبْدِيْ فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ

“ ‘হে আদম সন্তান, আমি অসুস্থ হয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমার সেবা-শুশ্রূষা করোনি।’

সে বলবে : ‘হে আমার রব, আমি কী করে তোমার সেবা-শুশ্রূষা করব, অথচ তুমি সারা জাহানের প্রতিপালক?’

আল্লাহ বলবেন : ‘তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল? কিন্তু তুমি তার সেবা করোনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি তার সেবা-শুশ্রূষা করলে নিশ্চিতভাবেই আমাকে তার কাছে পেতে?’

‘হে আদম সন্তান, তোমার কাছে আমি খাবার চেয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে খেতে দাওনি।’

সে বলবে : ‘হে আমার রব, আমি কী করে তোমাকে আহার করাতে পারি, অথচ তুমি সারা জাহানের প্রতিপালক?’

তিনি বলবেন : ‘তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে আহার চেয়েছিল? কিন্তু তুমি তাকে খেতে দাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে আহার করাতে তা হলে অবশ্যই তা আমার কাছে পেতে?’

‘হে আদম সন্তান, আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি।’

সে বলবে : ‘হে আমার রব, আমি কী করে তোমাকে পান করাবো, অথচ তুমি সারা জাহানের প্রতিপালক?’

তিনি বলবেন : ‘আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে পান করাতে, তা হলে অবশ্যই তা আমার কাছে পেতে।’”[৫২]

হাদীসটির প্রতি লক্ষ করুন, খাবার ও পানীয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার বলেছেন, ‘অবশ্যই তা আমার কাছে পেতে’। এবং অসুস্থের সেবা-শুশ্রূষা করার ক্ষেত্রে বলেছেন, ‘নিশ্চিতভাবেই তার নিকট আমাকে পেতে’। এটা বলেননি যে, ‘অবশ্যই তা আমার কাছে পেতে’। এই বিষয়টি বোঝানোর জন্য যে, আল্লাহ তাআলা অসুস্থ ব্যক্তির খুব নিকটে অবস্থান করেন। কারণ অসুস্থতার সময় ব্যক্তি খুব বিনয়ী থাকে, একাগ্রতার সাথে আল্লাহকে ডাকে, হৃদয়-মন ভাঙা থাকে, আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে; আর এগুলোই তার নিকট আল্লাহ তাআলার উপস্থিতিকে আবশ্যক করে। অথচ আল্লাহ তাআলা সাত আসমানের ওপর আরশে অধিষ্ঠিত এবং সৃষ্টিজগতের সবকিছু থেকে তিনি পৃথক; তবুও তিনি বান্দার কাছেই থাকেন। সুবহানাল্লাহি ওয়া বি-হামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম।

*****

(৫) প্রবন্ধ : অন্তর বিনষ্টকারী বস্তুসমূহ

অন্তর বিনষ্টকারী বস্তু হলো পাঁচটি :

১. মানুষের সাথে অধিক মেলামেশা করা,
২. অতিরিক্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা করা,
৩. গাইরুল্লাহর সাথে গভীরতর অন্তরঙ্গতা,
৪. সবসময় পরিতৃপ্তির সাথে খাওয়া এবং
৫.বেশি বেশি ঘুমানো।

জেনে রাখুন—নূর, হায়াত, শক্তি, সিহহাত, দৃঢ়তা, চোখ ও কানের সুস্থতা, ব্যস্ততা ও বিচ্ছিন্নতা থেকে দূরে থাকাকে সাথে করে অন্তর আল্লাহ তাআলার দিকে ও আখিরাতের প্রতি ধাবিত হয়।

কিন্তু উপরিউক্ত এই পাঁচটি বস্তু অন্তরের নূরকে নিভিয়ে দেয়, অন্তর্দৃষ্টিকে নিস্তেজ করে ফেলে, বান্দার কানকে ভারী করে তোলে; যদি একেবারে বধির না করতে পারে তবে প্রচণ্ড দুর্বল করে দেয়, অন্তরের সুস্থতায় ব্যাঘাত ঘটায়, দৃঢ়তায় স্থবিরতা এনে দেয়। যে ব্যক্তি এগুলো অনুভব করতে পারে না সে মৃত অন্তরের অধিকারী। কারণ মৃত ব্যক্তির শরীরে আঘাত করলে সে কোনো ব্যথা অনুভব করে না। ফলে পরিপূর্ণতা অর্জনের পথে এটি বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং যে উদ্দেশ্যে মানুষের সৃষ্টি তাতে পৌঁছাতে বেশ বিঘ্নতা সৃষ্টি করে।

---

[৫২] মুসলিম, ২৫৬৯।

এই পাঁচটি বস্তু বান্দার অন্তরে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে, খাইর ও কল্যাণ হাসিলের পথ রুদ্ধ করে, পথ চলতে বাধা দেয়, অন্তরে বিভিন্ন রকমের রোগ সৃষ্টি করে; যা থেকে নিরাময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে মৃত্যুর আশঙ্কা প্রবল হয়।

অধিক মেলামেশার প্রভাব : অধিক মেলামেশার ফলে আদম সন্তানদের শ্বাসপ্রশ্বাসের ধোঁয়ায় অন্তর ভরে ওঠে; এক পর্যায়ে এর প্রভাবে অন্তর কালো হয়ে যায়। বিক্ষিপ্ততা, বিভক্তি, দুঃখ-কষ্ট, পেরেশানি ও দুর্বলতার সৃষ্টি করে। এমন ভার বহন করতে হয় যা বহন করার ক্ষমতা ব্যক্তির থাকে না; যেমন : অসৎ বন্ধুদের জন্য খরচ করা, তার নিজের উপকার-কল্যাণকে নষ্ট করে তাদের সময় দেওয়া, তাদের সান্নিধ্য আর তাদের বিষয়াদির মধ্যে ডুবে থাকার কারণে নিজের ভালোমন্দ থেকে অমনোযোগী থাকা, তাদের চাওয়া-পাওয়ার উপত্যকায় নিজের চিন্তাভাবনাকে বিসর্জন দেওয়া ইত্যাদি। সুতরাং আল্লাহ তাআলার জন্য এবং আখিরাতের জন্য তার আর কী অবশিষ্ট থাকে?!

এগুলোর পাশাপাশি মানুষের সাথে মাখামাখি আরও কত ধরনের যে বিপদ ও শাস্তি ডেকে আনে আর নিয়ামাত দূরে রাখে তার কোনো ইয়ত্তা নেই! কত পরিশ্রম আর কাজ যে নামিয়ে আনে এবং কত কাজ যে পণ্ড করে দেয় তার কোনো হিসেব নেই। মানুষের জন্য মানুষ ছাড়া আর কি কোনো বিপদ আছে? আবূ তালিবের মৃত্যুর সময় তার অসৎ বন্ধুদের চেয়ে তার জন্য অধিক ক্ষতিকর আর কিছু কি ছিল?! তারা তার সাথে জোঁকের মতো লেগে ছিল; তারা তার মাঝে ও একটি কথার মাঝে দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিল; যা তার জন্য চিরস্থায়ী সৌভাগ্য ও শান্তি বয়ে আনত।

দুনিয়ার জীবনে ভালোবাসা ও মহাব্বতের এই সম্পর্কগুলো, যেখানে একজন আরেকজনকে সর্বক্ষেত্রেই প্রাধান্য দেয়; সেই সম্পর্কগুলোই কিয়ামাতের দিন শত্রুতায় রূপান্তরিত হবে, মেলামেশাকারী ব্যক্তি আফসোসে নিজের হাত কামড়াতে থাকবে। হায়, যদি তাদের সাথে সম্পর্কে না জড়াতাম! যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُوْلُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ﴿٢٧﴾ يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِيْ لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿٢٨﴾ لَّقَدْ أَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِيْ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُوْلًا ﴿٢٩﴾

"জালিমরা সেদিন নিজেদের হাত কামড়াতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, 'হায় আফসোস, আমি যদি রাসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম! হায় আমার দুর্ভাগ্য, হায়, আমি যদি অমুককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করতাম! আমার কাছে উপদেশ আসার পর সেই আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। মানুষের জন্য শয়তান বড়োই বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হয়েছে।"[৫৩]

মানুষের সাথে মেলামেশা করার ক্ষেত্রে উপকারী একটি মূলনীতি হলো : সব ধরনের কল্যাণকর কাজে তাদের সাথে মিশবে। যেমন : জুমুআর সালাতে, জামাআতে, ঈদের সালাতে, হাজ্জে, ইলম শিখতে, জিহাদ করতে, উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইত্যাদি। আর অকল্যাণ ও মন্দ কাজের ক্ষেত্রে তাদের থেকে দূরে থাকবে।

---

[৫৩] সূরা ফুরকান, ২৫ : ২৭-২৯।

এমনিভাবে ফায়দাহীন বৈধ কাজেও মানুষজন থেকে পৃথক থাকবে। হ্যাঁ যদি মন্দ ও খারাপ কোনো বিষয়ে তাদের সাথে মেশার প্রয়োজন পড়ে এবং তাদের থেকে দূরে থাকা সম্ভব না হয়; তা হলে তাদের সাথে একমত হওয়া থেকে কঠোরভাবে বেঁচে থাকবে এবং তাদের দেওয়া কষ্ট সহ্য করবে। কারণ কারও যদি শক্তি ও সাহায্যকারী না থাকে তা হলে তারা অবশ্যই তাকে কষ্ট দেবে। তবে এই কষ্টের পরেই তার জন্য রয়েছে ইজ্জত-সম্মান, মহাব্বত, শ্রদ্ধা, প্রশংসা; তা মানুষের নিকট থেকেও সে পাবে আবার সমস্ত মুমিন এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেও পাবে। কিন্তু যদি তাদের সাথে একমত পোষণ করে তা হলে এর পরে তার ভাগ্যে জুটবে অপমান, লাঞ্ছনা, শাস্তি ও নিন্দা; মানুষের কাছ থেকেও এবং সমস্ত মুমিন ও আল্লাহ তাআলার কাছ থেকেও।

সুতরাং মানুষের দেওয়া কষ্ট ও পেরেশানিতে সবর করাই হলো কল্যাণকর, পরিণতিতে উত্তম এবং প্রশংসিত। আর যদি বৈধ কিন্তু অতিরঞ্জিত কোনো বিষয়ে তাদের সাথে মিশতেই হয় তা হলে যদি শক্তি-সামর্থ্য থাকে সেই মজলিসকে আল্লাহ তাআলার যিক্‌রের মজলিসে পরিণত করবে, এ ক্ষেত্রে নিজেকে উৎসাহিত করবে এবং অন্তরকে দৃঢ় রাখবে। শয়তানি কর্মকাণ্ড ও ওয়াসওয়াসার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবে না; যেমন : এটা তো রিয়া (লোক-দেখানো আমল), এটা করা মানে নিজের বুজুর্গি দেখানো, মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা কামানোর ধান্দা ইত্যাদি। এগুলোর প্রতি তোয়াক্কা না করে তার সাথে লড়াই করবে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে। আর যথাসাধ্য মানুষজনকে কল্যাণের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করবে, আহ্বান জানাবে।

(৬) প্রবন্ধ : আখিরাত থেকে দূরে থাকার যত কারণ

যদি **প্রশ্ন** করেন : এমন জীবন যা চিরসুখের, যার কোনো তুলনা নেই সে জীবন অন্বেষণ করা থেকে নফসের দূরে থাকার কারণ কী? কীসে তাকে এর থেকে ভুলিয়ে রাখছে? আর এই ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রতি কেন তার এত আগ্রহ; যা ছায়া, কল্পনা আর স্বপ্নের মতো? ইলম ও জানার ঘাটতি নাকি আখিরাতকে অস্বীকার করার কারণে? নাকি বুদ্ধি-বিবেচনায় ঘুণ ধরেছে ফলে তা থেকে অন্ধ হয়ে আছে? নাকি বর্তমানে যা চোখে দেখা যাচ্ছে তাকেই প্রাধান্য দিচ্ছে যা অনুপস্থিত, যা ঈমানের মাধ্যমে জানা যায় তার ওপর?

এর উত্তর হলো : প্রশ্নোক্ত সবগুলোই এর কারণ।

আর এর **সবচেয়ে শক্তিশালী কারণ** হলো ঈমানের দুর্বলতা। কেননা ঈমান হলো আমলের রূহ বা প্রাণ। ঈমানই ব্যক্তিকে আমলে উদ্‌বুদ্ধ করে, উত্তম ও নেককাজ করতে আদেশ দেয়, অশ্লীল ও অপকর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে নিষেধ করে। ঈমানের শক্তি অনুসারেই ব্যক্তি আমলে অগ্রসর হয়, আদেশ-নিষেধ পালনে তৎপরতা দেখায়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩٣﴾

"যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো, তা হলে এ কেমন ঈমান, যা তোমাদের
এমন খারাপ কাজের নির্দেশ দেয়?"[৫৪]

মূলকথা হলো যখন ঈমানের শক্তি পূর্ণতা পায় তখন আখিরাতের জীবনের প্রতি আগ্রহও প্রবল ও তীব্র হয় এবং তা অন্বেষণে ব্যক্তির তৎপরতাও কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

দুই নং কারণ : অন্তরে অখণ্ড গাফলত এসে ভিড় করা। কেননা গাফলত বা অমনোযোগিতা হলো অন্তরের নিদ্রা। আর এ কারণেই আপনি অনেক মানুষকে এমন পাবেন যারা বাহ্যিকভাবে জাগ্রত কিন্তু প্রকৃতার্থে ঘুমন্ত। কিন্তু আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন, তারা জাগ্রত অথচ তারা ঘুমিয়ে রয়েছে। এর বিপরীত অবস্থা হলো তাদের যাদের অন্তর জাগ্রত কিন্তু তারা শারীরিকভাবে ঘুমন্ত। কেননা অন্তর যখন প্রাণবন্ত থাকে তখন শরীর ঘুমিয়ে পড়লেও অন্তর ঘুমায় না। আর সবচেয়ে বেশি প্রাণবন্ত অন্তরের অধিকারী ছিলেন আমাদের নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সেই ব্যক্তি যার অন্তরকে আল্লাহ তাআলা নবিজির মহাব্বতে ও তাঁর রিসালাতের পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে জাগ্রত করে দিয়েছেন।

[৫৪] সুরা বাকারা, ২ : ৯৩।